অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩০৪।

অদ্বৈত মতের সমালোচনা।

মূল সত্য এক বই দুই নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সত্যের এই-রূপ মৌলিক একত্ব আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হই? তাহার চাবি আমাদের প্রতি জনের অন্তরে রহিয়াছে; —কি? না আত্মা। আপ-নাকে কেহই এক ছাড়া দুই বলিয়া জানিতে পারে না। আমরা আপন আত্মার আদর্শ অনুসারে অন্যের আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি; আর, তাহারই আদর্শ অনুসারে আমরা পরমাত্মার অসীম দেশকালব্যাপী মহান্ একত্ব উপলব্ধি করি। পরমাত্মার একত্ব এক দিকে যেমন আমরা আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করি, আর একদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বত্রই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আমরা দেখি যে সজা-তীয় বিজাতীয় সমস্ত জীবজন্তু এক ছাঁচে গঠিত; সজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত উদ্ভিদ একছাঁচে গঠিত। দেখি যে, উদ্ভিদ্ এবং জীব উভয়-শ্রেণীই একই প্রকার কতকগুলি মূল নিয়মের অধীনে জন্মগ্রহণ করে, বর্দ্ধিত হয়, বিকসিত হয় এবং বিলীন হয়। আরো সবিশেষ বিব-রণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, উদ্ভিদের বীজ যেমন গোলা-কৃতি, জীবের অণ্ড তেমনি গোলাকৃতি, পৃথিবী গ্রহ চন্দ্রাদি বৃহদায়তন জড়পিণ্ড-সকল তেমনি গোলাকৃতি; —জড় উদ্ভিদ্ এবং জীবের আদিম উপাদান একই ছাঁচে গঠিত। আরো এই দেখি যে, জীবশরীরের সারভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-গোলিকার চক্রাকৃতি নাড়ীপথ, এবং আকাশ-গামী গ্রহচন্দ্রাদির অনাবৃত গতিপথ একই ছাঁচে গঠিত। আকাশে এ

যেমন একত্বের চক্রানুচক্র সর্ব্বত্রই ঘূর্ণায়মান দেখি, কালেও তাহাই দেখি; দেখি যে, বৎসরের দুই পক্ষ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, মাসের দুই পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ, দিনের দুই পক্ষ অহোরাত্র, ক্ষণের দুই পক্ষ নিশ্বাস-কাল প্রশ্বাস-কাল সকলই একই ছন্দে ঘূর্ণায়মান। এইরূপ যখন দেখি যে, অসীম দেশ কালের সমস্ত ঘটনা একই অপরিমেয় মহান্ কুলাল চক্রে পরিগঠিত হইতেছে, তখন আমাদের মনের অভ্যন্তরে আপনা হইতেই ধ্বনিত হইয়া উঠে - একমেবাদ্বিতীয়ং। কিন্তু ইন্দ্রিয়-মনের দ্বার দিয়া আমরা নূতন কিছুই দেখি না—আত্মা দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহারই প্রতিবিম্ব দেখি। আমার আত্মার আদর্শ অনুসারে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্ব স্থিররূপে উপলব্ধি করি, তাহারই আদর্শ অনুসারে তেমনিই স্থিররূপে সর্ব্বজগদ্ব্যাপী মহান্ আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি। আবার, আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা তোমার কার্য্যাদি দর্শনে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্বের পোষকতা পাই, তেমনি জগৎকার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমাত্মার মহান্ একত্বের পোষকতা পাই। ইহা ব্যতীত, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখেন যে, সমস্ত সৌর জগৎ একসময়ে সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল, সূর্য্য অন্তর-তর দ্বিতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল; দ্বিতীয় সূর্য্য আরো অন্তরতর তৃতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল;—এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন্ আদিকালে অন্তর হইতে অন্তরে কোথায় প্রবিষ্ট ছিল তাহার বাষ্পেরও সন্ধান কেহই বলিতে পারে না। আবার, আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন (যাঁহারা সাঁতার জানেন তাঁহাদের সোলা আবশ্যক হয় না, তেমনি তাঁহাদের দূরবীক্ষণ আবশ্যক হয় নাই—নিছক ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন) যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম সূর্য্যে সমস্ত বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড একীভূত ছিল। সে সূর্য্য জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতা পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি। সে শক্তি কল্পনা-চক্ষে দেখিতে গেলে এমনি সূক্ষ্ম যে, "নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ" "সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া" তাহা আছে কি নাই তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারা যায় না ;— কিন্তু জ্ঞান চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা যেমন মহা সূক্ষ্ম তেমনি তাহা মহা পরাক্রম-শালী ; —তাহা অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর অন্তঃসারে পরিপূর্ণ ;—তাহার ভিতরে জ্ঞান জাগিতেছে—প্রেম জাগিতেছে—ন্যায় জাগিতেছে—করুণা জাগিতেছে, অপরিসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে, সমস্তই তাহার অন্তর্ভূত। আমাদের দেশের কোনো পুরাতন মহর্ষি পরমাত্মার অতলস্পর্শ গভীর এবং অপরিমেয় মহান্ একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব ধ্যানে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি যখন হয় নাই,—যখন আর কিছুই ছিল না—অন্ধকারের অভ্যন্তরে অন্ধকার গূঢ় ছিল—তখন "আনীদবাতং" একাকী পরমাত্মার বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল। বায়ু বিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস কবিতার পরাকাষ্ঠা কিন্তু তাহা কবিতা মাত্র নহে—তাহা অনির্ব্বচনীয় গভীর সত্য। মহাদেবের যোগাবস্থার বর্ণনা-কালে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং"

বৃষ্টির উপক্রম হয় নাই এমন জলদজাল, তরঙ্গ উঠে নাই এমন মহাসাগর ;—মনে কর বর্ষার প্রারম্ভে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ,—বৃষ্টির সমস্ত জোগাড় হইয়াছে কেবল তাহার পতন-মাত্র অবশিষ্ট ; সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গের সমস্ত পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে—কিন্তু সমুদ্র এখন স্থির! বৃষ্টি হয়-হয়—কিন্তু এখনো হয় নাই ; বৃষ্টির পতন এইরূপ হয় এবং নয়ের মধ্যে দোলায়মান। কারণকে আশ্রয় করিয়া

থাকা এবং কার্য্যে অভিব্যক্ত হওয়া এই দুয়ের মধ্যে কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তির এই যে দোলায়মান ভাব—ইহাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উপমেয়। কঠিন প্রস্তরের মধ্যেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আর, তাহারই অদৃশ্য প্রভাবে সেই প্রস্তরের ক্রোড়-স্থিত বৃক্ষ-বীজ হইতে অঙ্কুর নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। "আণীদবাতং" "বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস" এই পুরাতন ঋষি বাক্যটির অভ্যন্তরে কি অকথিত মহাপুরাণ জাগিতেছে—যাঁহার কবির কর্ণ তিনিই তাহা শুনিতে পা'ন। পরমাত্মার এইরূপ অসীম শক্তি-পরিপূর্ণ গম্ভীর একত্ব, যাহা বেদোপনিষদে বহুধা গীত হইয়াছে, আমাদের দেশীয় ভাষায় তাহার নাম সগুণ একত্ব এবং জর্ম্মান দেশীয় সুবিখ্যাত দর্শনকার কাণ্টের ভাষায় তাহার নাম Synthethic unity; গুণ-শব্দের মুখ্য অর্থ রজ্জু;—ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সমস্ত জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে

"স সেতু র্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"

লোকভঙ্গ নিবারণার্থে ঈশ্বর সেতু স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ ঈশ্বরের ঐশীশক্তি আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে তিন অবয়বে বিভক্ত—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। যেমন জড়ত্ব, এবং জড়তা এ দুই শব্দের অবিকল একই অর্থ, সত্ত্ব এবং সত্তা এ দুই শব্দেরও তাই। কালে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহা চিরকাল যাহা আছে তাহাই আছে, তাহারই নাম সৎ অর্থাৎ নিত্য সত্য। সেই সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু কালে প্রকাশিত হয় তাহাতে সেই সতের স্থায়িত্ব লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তে বলিয়া আমরা বলি যে তাহার সত্তা আছে অথবা সত্ত্ব আছে। সৎ অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আবির্ভূত হয় তাহা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তন-

শীল ঘটনাতে সতের প্রকাশও আছে—সত্ত্বও আছে, প্রকাশের প্রতিবন্ধকও আছে—তমোও আছে, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার চেষ্টাও আছে—রজোও আছে। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব কতক অংশে প্রকাশ পাইতেছে যেমন—তেমনি প্রকাশের প্রতিবন্ধকও বর্ত্তমান আছে, আর, সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টাও বর্ত্তমান আছে; কেন না প্রকাশের যদি প্রতিবন্ধক না থাকিত তবে মুকুল এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ-বিকসিত পুষ্প হইয়া উঠিত; আর, যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত তবে মুকুল অল্পে অল্পে বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব যাহা কিয়দংশে প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকাশের ভাবই সত্ত্বগুণ, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই তমোগুণ; আর, সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই রজোগুণ। এ যাহা আমি বলিতেছি ইহা আমার ঘর গড়া কথা নহে। আমাদের দেশের পুরাণ তন্ত্র দর্শন সকলেই আমার ঐ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া একবাক্যে বলিতেছেন যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক; আর, তমোগুণ যে প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। শাস্ত্রে দুইরূপ কথা আছে; এক রূপ কথা ঐ যাহা বলিলাম,—কি? না সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক, তমোগুণ প্রতিবন্ধকতাত্মক। আর একরূপ কথা এই যে, সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজোগুণ দুঃখাত্মক, তমোগুণ বিষাদাত্মক অর্থাৎ অবসাদাত্মক। এ দুইরূপ কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা দুই কথা নহে—তাহা একই কথার এপিট ও পিট। মনে কর এক জন কবির মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা হাতে কলমে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার

সঙ্গে বিষাদের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতঃপর মনে কর যে, কবি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাঁহার মনের ভাব কায়ক্লেশে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা একটি কষ্টকর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পরে মনে কর যে, তিনি তাঁহার মনের ভাব সম্যক্ রূপে ব্যক্ত করিয়া সফল-মনোরথ হইলেন। ইহাতে তাঁহার কত না আনন্দ হইল! অতএব যাহা প্রকাশাত্মক তাহা সুখাত্মক, যাহা চেষ্টাত্মক তাহা দুঃখাত্মক, যাহা প্রতিবন্ধকতাত্মক তাহা বিষাদাত্মক—এ কথা খুবই সত্য। এতদ্ব্যতীত, শাস্ত্রের আর একটি কথা এই যে, সত্ত্বরজ এবং তমোগুণ জগতের আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তাহাদের কোনোটি কোথাও অপর দুইটির সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী অবস্থিতি করে না; তিন গুণ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে এবং এক এক বস্তুর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিমাণে মিলিয়া মিশিয়া এক সঙ্গে অবস্থিতি করে। জ্ঞানালোকের প্রকাশ—সত্ত্বগুণ প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরের কথা; সে কথা তিনি জগৎ-পুস্তকের গোড়ার অধ্যায়ে অতীব অস্ফুট-রূপে ইঙ্গিত করেন মাত্র—শেষের অধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলেন। প্রকৃতির সেই যে অন্তরের কথা—সত্ত্বগুণ বা জ্ঞানালোক—প্রস্তর পাষাণাদিতে তাহার প্রকাশও যেমন অল্প, প্রকাশের চেষ্টাও তেমনি অল্প; এত অল্প যে নাই বলিলেই হয়। প্রস্তর পাষাণাদিতে প্রকাশের প্রতিবন্ধকতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই কারণে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রস্তর পাষাণাদি তমোগুণ-প্রধান। জীবজন্তুতে জ্ঞানালোকের প্রকাশ, আর, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক, দুয়েরই অপেক্ষা প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। সে চেষ্টার ভীষণ মূর্ত্তি যদি কেহ দেখিতে চা'ন, তবে Darwin তাহা খুবই বিসদ রূপে দেখাইয়াছেন;—কি? না Struggle for existence সত্তা-লাভের

জন্য প্রাণপণ উদ্যম। তাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে জীবজন্তু অপেক্ষাকৃত রজোগুণ-প্রধান। মনুষ্য নিতান্ত অসভ্য না হইলে জীবিকানির্ব্বাহ করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য্য মনে করে না—সভ্যলোক মাত্রই জ্ঞান ধর্ম্ম সদ্ভাব এবং সদালাপের চর্চ্চা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করাকেই জীবনের প্রধানতম কার্য্য মনে করেন। মনুষ্য মণ্ডলীতে জ্ঞানালোকের এইরূপ প্রকাশাধিক্য দেখিয়াই শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যকে অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণ ব্যক্ত প্রকৃতিতেও যেমন অব্যক্তপ্রকৃতিতেও তেমনি (অর্থাৎ কার্য্যরূপী ব্যক্ত জগতেও যেমন; ঐশীশক্তিরূপী অব্যক্ত জগতেও তেমনি) এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করে। নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনের মতে মূল প্রকৃতি এবং সেশ্বর দর্শনাদির মতে ঐশীশক্তি জগতের বীজ স্বরূপ। বীজেতে বৃক্ষের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই বর্ত্তমান আছে—অথচ তিনই অনভিব্যক্ত; মূল প্রকৃতিতে সেইরূপ জগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই অন্তর্ভূত রহিয়াছে—কেবল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ কোনোটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তিন গুণের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমনি সৌহার্দ্দ। যখন ব্যক্ত তখন তিনই ব্যক্ত-যখন অব্যক্ত তখন তিনই অব্যক্ত। যদি রাত্রি ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে (প্রতিক্রিয়া-সূত্রে) দিনও আসিবে সন্ধ্যাও আসিবে; যদি দিন ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা আসিবে রাত্রি আসিবে; যদি সন্ধ্যা ব্যক্ত হয়, তবে তাহার পিছনে পিছনে রাত্রি আসিবে দিন আসিবে। যদি ব্যক্ত না হইবারই হয় তবে—না রাত্রি, না দিন, না সন্ধ্যা—কেহই ব্যক্ত হইবে না। শাস্ত্রেরও অভিপ্রায়ানুসারে সত্ত্বরজস্তমোগুণ, এইরূপ, ব্যক্ত

হইবার সময় তিনই ব্যক্ত হয়; অব্যক্ত থাকিবার সময় তিনই মূল প্রকৃতিতে অথবা ঐশীশক্তিতে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। আমাদের দেশের বহুতর শাস্ত্র এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে - ঈশ্বরের আদেশে জীবের ভোগ-মুক্তি-সাধনের জন্য মূল প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণাত্মক জগৎ অভিব্যক্ত হয়। আমাদের দেশের নানা শাস্ত্রের নানা বিরোধী মতের সমন্বয় করিয়া মোট কথা যাহা পাওয়া যায় তাহা এই:—ভগবদ্গীতায় আছে "একাংশেন স্থিতো জগৎ" ঐশীশক্তির একাংশে ভর করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে। * ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন;—মহা মহা সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকটেও তিনি একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না। ঐশীশক্তির প্রকাশ অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র-

---

* সে দিন ইষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে পাদ্রি হেণ্ডরসন সাহেবের একটি বক্তৃতায় দেখিলাম যে, তিনি বেদান্তের তত্ত্ব এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, এই যে জগৎ ইহাই ব্রহ্ম—তাহা ছাড়া ব্রহ্ম আর কিছুই নহেন—ইহাই বেদান্ত!!! ইহা তাঁহার জানা উচিত যে, বেদান্তের মতে জগৎ প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে—আর মায়া-মূলক এই যে দৃশ্যমান জগৎ ইহা কেবল ব্রহ্মের একাংশ মাত্র।—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার অর্থ এ নহে যে, "জগৎই ব্রহ্ম আর ব্রহ্মই জগৎ"। ইহার অর্থ এই যে, জগৎ কিছুই নহে, আর ব্রহ্মই জগতের সর্ব্বস্ব; যেমন তিনি জগতের সর্ব্বস্ব, তেমনি তিনি জগতের অতীত; সুতরাং জগৎকে ব্রহ্ম, উপলক্ষ-স্বরূপেই, বলা যাইতে পারে, আর, বেদান্তে তাহাই বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম শব্দের অর্থই এই যে, ব্রহ্ম জগতের পরপার। প্রায়শই পাদ্রি সাহেবেরা বেদান্ত না জানিয়া বেদান্তের মত খণ্ডন করিয়া থাকেন।

কারেরা তাহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই ইচ্ছাপ্রবর্তিত নিয়ম। তিনি অনিয়মিত রূপে, অযথাকালে, অযথা পাত্রে, আপনার ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না—ইহাই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। উপনিষদে আছে "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" যথা কালে, যথা পাত্রে, যেরূপ অর্থ বিধান করা তাঁহার সর্ব্বদর্শী মহাজ্ঞানের সহিত সঙ্গত তিনি সেইরূপ অর্থ সকল বিধান করেন। ত্রিগুণাত্মক শক্তির মূলাধার স্বরূপ ঈশ্বরের এইরূপ সগুণ একত্ব Synthetic unity স্বতন্ত্র, আর, অদ্বৈত মতানুযায়ী জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্বতন্ত্র। শেষোক্ত একত্ব আমাদের দেশীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম নির্গুণ একত্ব, আর, কাণ্টের ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম analytic unity। আমি পরে দেখাইব যে, ঈশ্বরের সগুণ একত্ব Synthetic unity যাহা সমস্ত জগতের বন্ধন-স্বরূপ তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন সত্য এবং তাহাই সাধকের উপযুক্ত লক্ষ্যস্থান; আর, সেই সঙ্গে দেখাইব যে, নির্গুণ একত্ব analytic unity যাহা রাজ্যহীন রাজার সহিত অথবা আলোক-বিহীন দীপের সহিত উপমেয়, তাহার পদবী উহা অপেক্ষা অনেক নিচু। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণ একত্ব কিরূপে সমর্থন করেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা আবশ্যক। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন

"সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদম্বয়ো
স্ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥"

অর্থাৎ যেমন "সেই এই কালিদাস" এই কথাটির মধ্য হইতে 'সেই এবং এই' এই দুই বিরোধী ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র কেবল কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি তত্ত্বমসি এই বাক্যের মধ্য হইতে ত্বংশব্দ-সূচিত জীবের অবিদ্যা এবং তৎশব্দ-সূচিত ঈশ্বরের মায়া অর্থাৎ ঐশী শক্তি পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লক্ষিত হ'ন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—আমি যখন কালিদাসকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম তখন তিনি পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতেছিলেন, এখন দেখিতেছি যে, তিনি শকুন্তলা লিখিয়া মহাকবি হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম "সেই এই কালিদাস"। এই কথাটিকে দুই রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে;—এক এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এখন তিনি সেই কালিদাসই বটে কিন্তু তাহা-ব্যতীত এখন তিনি মহাকবি কালিদাস—এখন ব্যাকরণ সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার মন বোঝাই করা রহিয়াছে। কালিদাসের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি সম্বলিত এই যে একত্ব ইহারই নাম সগুণ একত্ব synthetic unity। "সেই এই কালিদাস" এই কথাটিকে অপর এইরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে তিনি মূর্খ ছিলেন এ কথা ছাড়িয়া দেও; আর, এখন তিনি মহা পণ্ডিত হইয়াছেন এ কথাও ছাড়িয়া দেও; দুই অবস্থার দুই কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ কেবল তিনি কালিদাস এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। এইরূপ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুই কূল-বর্জ্জিত কালিদাসকে কালিদাস বলাও যা আর খালিদাস বলাও তা—একই। কালিদাসের এই যে ফাঁকা একত্ব ইংরাজিতে যাহাকে বলে bare identity, ইহারই নাম নির্গুণ একত্ব analytic unity। শেষোক্ত দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, কালিদাস হইতে যেমন

তাঁহার পঠদ্দশা-সুলভ অজ্ঞানাবস্থা বাদ দেওয়া হইল, জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার জীবাবস্থা-সুলভ অবিদ্যা বাদ দেও; আর কালিদাস হইতে যেমন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা-সুলভ কবিতা-শক্তি বাদ দেওয়া হইল জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার পূর্ণাবস্থা-সুলভ ঐশী শক্তি বাদ দেও। এইরূপ জীবের পক্ষ হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের পক্ষ হইতে ঐশী শক্তি বাদ দিয়া কেবল মাত্র চৈতন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এইরূপ নির্গুণ একত্ব যাহা অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপাদন করেন তাহা ছাড়া বেদোপনিষদে আর-একরূপ একত্বের বহুতর উল্লেখ আছে—তাহার সাক্ষী "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" "তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন"; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ঈশ্বর-দ্বারা সমস্ত জগৎ আদ্যোপান্ত আচ্ছাদিত রহিয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্গুণ একত্ব এবং শেষোক্তরূপ সগুণ একত্ব দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মায়া এবং অবিদ্যা লইয়া বাচালতা করিতে আমাদের দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমান পটু; কিন্তু মায়া এবং অবিদ্যা শব্দের দার্শনিক তাৎপর্য্য কি তাহার প্রতি অতি অল্প লোকেই বিবেচনার সহিত প্রণিধান করেন। সকলেই জানেন যে, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম, মরীচিকায় জল-ভ্রম ইত্যাদি প্রকার ভ্রমই মায়া শব্দের বাচ্য। কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি এটা হয় তো না জানিতে পারেন যে, মায়া শব্দের মুখ্য অর্থ তাহা নহে। মায়া-শব্দের মুখ্য অর্থ ইন্দ্রজাল অর্থাৎ লোকে সচরাচর যাহাকে বলে জাদু। রামায়ণে আছে শূর্পনখা-রাক্ষসী মায়ামৃগ সৃষ্টি করিয়া সীতাকে ছলনা করিয়াছিল। এরূপ স্থলে মায়া-মৃগের উৎপাদিকা-শক্তি যাহা শূর্পনখার ইচ্ছাধীন তাহারই নাম মায়া; আর, সেই

মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সীতার যেরূপ ভ্রম হইয়াছিল সেইরূপ ভ্রমের নাম অবিদ্যা। সমস্ত জীবজন্তু চরাচর ঈশ্বরের ঐশী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ইহা দৃষ্টে পুরাতন কবিরা ঈশ্বরের ঐশী শক্তিকে ঐন্দ্রজালিকের মায়ার সহিত আর জীবজন্তু চরাচরের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞানকে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির ভ্রমের সহিত উপমা দিয়া জীবাশ্রিত সেই অজ্ঞানের নাম দিয়াছেন অবিদ্যা। একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী বিনা অবলম্বনে শূন্যে বিধৃত রহিয়াছে, অচেতন অণ্ডের আবরণ ভেদ করিয়া সচেতন জীব—সমস্ত সাজসজ্জা পরিধান করিয়া বিনির্গত হইতেছে, এ সকল ঐশ্বরিক ব্যাপারের ন্যায় পরমাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল কে কবে কোথায় দেখিয়াছে! মায়া কথাটা পুরাতন কবিদিগের উক্তি—তাহা কবিতা-ভাবে গ্রহণ করাই উচিত। ঐ কবির উক্তিটিকে চলিত ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশী শক্তি। মহামায়া শব্দের অবিকল ইংরাজি অনুবাদ আর কিছু না—Great magical power। মায়া-শব্দের অর্থ ঐশী শক্তি এটা আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে; পুরাণাদিতে ঐ ভাবের ভূরি ভূরি কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পাছে লোকে ঈশ্বরের ঐশী শক্তিকে রাক্ষস এবং দৈত্যদিগের তামসিক মায়ার সহিত সমান মনে করিয়া ভ্রমে পড়ে, এই জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে ঐশ্বরিক মায়া, দৈবী মায়া, আসুরী মায়া, রাক্ষসী মায়া, এইরূপ মায়ার নানা প্রকার শ্রেণী-বিভাগেরও অপ্রতুল নাই। অতএব ঈশ্বরের মহতী শক্তির প্রভাবকে মায়া বলিলে অথবা জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ ভ্রম-প্রমাদ-মোহকে অবিদ্যা বলিলে অসত্য কিছুই বলা হয় না;—কেবল এইটি মনে রাখিলেই হইল যে, ঈশ্বরের মায়া আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী মায়া নহে; তাহা সত্ত্বগুণাত্মিকা সত্যময়ী মায়া। প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে চির-

কালই আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশে তাহাকে দৈবী মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা-হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। সঙ্গীত মহলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীচের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে শুনিতে যত কর্কশ লাগে—উপরের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে তত কর্কশ শুনায় না ; এমন কি, প্রথম সপ্তকের সা'র সহিত যদি উপরিস্থ পঞ্চম সপ্তকের সা রে গা পা নি এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়, তবে ঐ সুরগুলি এমনি লপেট হইয়া একতানে মিলিয়া যায় যে, মনে হয় একটি মাত্র সুর সা একাকী ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের অভ্যন্তরে এ যেমন—সৃষ্টির অভ্যন্তরে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের এক একটি বিভিন্ন সুর হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া যতই উপরের সপ্তকের উপরের সুরে উত্থান করে, ততই সহযাত্রীদিগের সহিত একতানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের ভাব গ্রহণে এবং প্রেমরসাস্বাদনে সমর্থ হয়। অতএব এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার জ্ঞানবান্ এবং হৃদয়বান্ জীবদিগের নিকটে ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত করিয়া প্রতিজনের অন্তঃকরণের যোগ্যতা অনুসারে তাহাকে আপনার অনুপম আনন্দের ভাগী করিবেন, ইহারই জন্য তিনি মনুষ্যকে আপন আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ঈশ্বরের মায়া করুণার প্রস্রবণ; তাহা আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী বিভীষিকাও নহে, আর, অর্থশূন্য প্রলাপ-বাক্যও নহে। মায়া কাহাকে বলে এবং অবিদ্যা কাহাকে বলে তাহা বলিলাম। মায়া কি? না ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশী শক্তি। অবিদ্যা কি? না জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞান। অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী নির্গুণ একত্ব কিরূপ তাহাও

পূর্ব্বে বলিয়াছি। পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, "সেই এই কালিদাস" এই বাক্যের মধ্য হইতে কালিদাসের প্রথম বয়সের মূর্খতা এবং দ্বিতীয় বয়সের কবিতা-শক্তি বাদ দিয়া যেমন কালিদাসের পরিবর্ত্তে খালিদাস পাওয়া যায়, তেমনি জীবের মধ্য হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের মধ্য হইতে ঐশী শক্তি বাদ দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই জীব-ব্রহ্মের নির্গুণ একত্ব। পাঠক যদি ধৈর্য্য ধরিয়া গন্তব্য পথে আমাদের সহিত শেষ পর্য্যন্ত চলেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, জীবেশ্বরের এই যে নির্গুণ একত্ব ইহা ঈশ্বরের সমগ্র একত্বের অনেক নিচের ধাপে অবস্থিতি করিতেছে। দেখিতে পাইবেন যে, এরূপ নির্গুণ একত্ব সাধকের প্রথম প্রয়াণ স্থান মাত্র, তা বই তাহা সাধকের চরম গম্যস্থান হইতে পারে না। এখন আমরা তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথমে জীবব্রহ্মের ঐক্য স্থানটি পঞ্চদশী যেরূপ পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিয়াছেন তাহা দেখাইব, তাহার পরে পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে জীবেশ্বরের মধ্যে যেরূপ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে তাহা দেখাইব। তাহার পরে তৎতদ্বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক ছবি কোথায় পাওয়া যায়, এ কথা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে। পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে অদ্বৈতমতের সার সিদ্ধান্ত যেরূপ সুন্দর দার্শনিক বিবেক-প্রণালী অনুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ-পারিপাট্য দেখিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সে বিবেক-প্রণালী আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে process of analysis। পঞ্চ-দশী প্রথমে জ্ঞানের সূর্য্যকান্ত মণিকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া

তাহা হইতে জ্যোতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; তাহার পরে সেই জ্যোতিকে সূর্য্য এবং সূর্য্যকান্ত মণির—পরমাত্মা এবং জীবাত্মার ঐক্যস্থান করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জীবের সেই যে আত্ম-জ্যোতি তাহা কি। পঞ্চদশী বলিতেছেন—'সম্বিৎ'। সম্বিৎ শব্দের ঠিক্ অর্থ যদি পাঠক জানিতে চা'ন তবে তাহা আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে consciousness। যদি বল "কোথা হইতে পাইলে?" তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সম্বিতের ঐ অর্থটি উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। লাটিন ভাষায় যাহার নাম con, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম সং। Con উপসর্গের ইংরাজি অনুবাদ with কিম্বা together with। সং উপসর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ সব সহিতে মিলিয়া; তাহার সাক্ষী—বেদের একস্থানে আছে "সম্বদধ্বং" এবং বেদ-ভাষ্যে উহার অর্থ এইরূপ লেখা আছে যে, 'সহ বদত' অর্থাৎ 'সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে বল'। সমষ্টি-বন্ধন বলিতে বুঝায় সং-অষ্টি-বন্ধন, সমস্ত এক সঙ্গে জড়ো করিয়া আঁটি বাঁধা। সমাহার বলিতে বুঝায় সং-আহরণ একত্র করিয়া আনা—সমস্ত কুড়াইয়া একত্রে জড়ো করা, ইংরাজিতে যাহাকে বলে summing up। সম্যক্‌রূপে কিনা comprehensively—এখানেও সং এবং con এ দুই উপসর্গের অর্থের মিল রহিয়াছে। একদিকে সং এবং con, আর এক দিকে বিদ্যা এবং science;—প্রথম দুটার মধ্যে যেমন অর্থ-সাদৃশ্য, শেষ-দুটার মধ্যে অর্থ-সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে। con-পূর্ব্বক scienceও যা, আর, সং পূর্ব্বক বিদ্যাও তা—একই। আমার সঙ্গে এত দুর আসিয়া এখন-আর এ কথা বলিও না যে, consciousness এবং সম্বিৎ বলিতে একই অর্থ বুঝায় না—কিনারায় আসিয়া নৌকা-ডুবি করিও না। তা যদি কর তবে আরেকটি কথা বলি শ্রবণ কর;—

কোনো ব্যক্তি মূর্চ্ছা গেলে আমরা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মতো বলি যে, এ ব্যক্তির চেতন নাই; কিন্তু একজন প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য সেরূপ স্থলে বলেন "এ ব্যক্তির সংজ্ঞা নাই", আবার, একজন নবীন ইংরাজিজ্ঞ ডাক্তার বলেন "এ ব্যক্তির consciousness নাই।" এস্থলে প্রবীণ এবং নবীন—বৃদ্ধ এবং অবৃদ্ধ—উভয়োর্ব্বচনং গ্রাহ্যং। অতএব সংজ্ঞা এবং consciousness এ দুই শব্দের অর্থ একই তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞা-ধাতুর অর্থও জানা, বিদ-ধাতুর অর্থও জানা—সংজ্ঞাও যা সম্বিৎও তা—একই;—প্রভেদ কেবল এই যে, সংজ্ঞা-শব্দ সাহিত্য-মহলে বেশী প্রচলিত—সম্বিৎ শব্দ দর্শন-মহলে বেশী প্রচলিত।

ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সুবিখ্যাত দর্শনকার Hamilton consciousness-শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সম্বিৎ শব্দ অবিকল সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। Hamilton বলিতেছেন—

In taking a comprehensive survey of the mental phenomena, these are all seen to comprise one essential element or possible only under one necessary condition. This element or condition is consciousness. In this knowledge they appear. or are realized as phenomena, and with this knowledge they likewise disappear, or have no longer a phenomenal existence ; So thal consciousness may be compared to an internal light, by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible" ইহার কিয়ৎ পরেই বলিতেছেন—

When I know, I must know that I know.—when I

feel, I must know that I feel,—when I desire, I must know that I desire. The knowledge, the feeling, the desire, are possible only under the condition of being known. The expression I know that I know, I know that I feel, I know that I desire, are translated by, I am conscious that I know, I am conscious that I feel, I am conscious that I desire. Hamilton এই যাহা বলিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই যে, বিভিন্ন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সঙ্গে একই অভিন্ন জ্ঞান যাহা সাক্ষীরূপে লাগিয়া থাকে তাহারই নাম সম্বিৎ। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্
ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥"

শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয় সকল বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত (অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ কিনা consciousness তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। সে দিন আমার একজন বন্ধু আমার কৃত ততো এবং তৎ এই দুই শব্দের অর্থ শুনিয়া সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমি টীকা হাতড়িয়া দেখিলাম যে, আমি ঐ দুই শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছিলাম টীকায় অবিকল তাহাই লিখিত রহিয়াছে; ইহা দেখিয়া একদিকে যেমন আমার আনন্দ হইল আর এক দিকে তেমনি দুঃখ হইল;—দুখের কারণ এই যে, এমন বিসদ টীকা সত্ত্বেও পুঁথির উৎকৃষ্ট মূল বচনগুলির অর্থ নানালোকে নানারূপ করেন, অথচ প্রকৃত তাৎপর্য্যটি তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়। আমি যে, ঐ দুটা শব্দ প্রথম দেখিবা মাত্রই ও-দুটার ঠিক্ অর্থ ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের

বিষয় নহে, কেননা বিবেক, বিবেচনা, analysis, বলিয়া যে একটা দার্শনিক প্রণালী আছে তাহা তৎপূর্ব্বে আমার জানা ছিল, আর তাহা জানা বড় যে একটা বেশী বিদ্যার কার্য্য তাহাও নহে—বার-কত যাঁহারা ইংরাজি-দর্শনের পাত উল্টাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা জানেন। টীকায় স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে "ততো বিভক্তা" কিনা "তেভ্যো বিভক্তা" সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত। ততঃ শব্দের অর্থ তস্মাৎও হয় আর তেভ্যঃও হয়—এখানে ততঃ শব্দের অর্থ তেভ্যঃ কিনা সেই সকল বিষয় হইতে। "তৎসম্বিৎ" ইহার অর্থ ফস্ করিয়া পাঠক মনে করেন যে, সেই সম্বিৎ; কিন্তু টীকাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে তৎসম্বিৎ কিনা "তেষাং শব্দাদীনাং সম্বিৎ" সেই শব্দাদির সম্বিৎ consciousness of those sensations of sound &c। বিভক্ত শব্দের অর্থ টীকায় এইরূপ আছে যে, "বুদ্ধ্যা বিবেচিতা" অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত analysed by the understanding; Hamiltion প্রভৃতি যাহাকে বলেন distinguished but not separated। অতএব পঞ্চদশীর ঐ শ্লোকের অর্থ কিয়ৎপূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা তাহার অবিকল অনুবাদ। তাহা আর-একবার বলি শ্রবণ করুন। "শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ" শব্দস্পর্শাদি বেদ্য বিষয় সকল (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে sensations) "বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্" বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। ততো বিভক্তা তৎ সম্বিৎ" সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত (অর্থাৎ distinct) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ consciousness of those sensations, "ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে" তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। এইখানে বিবেচনা-পদ্ধতির বা বিবেক-পদ্ধতির হস্ত দেখা যাইতেছে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে analysis। যেমন বালির সঙ্গে চিনি মিশ্রিত থাকিলে পিপীলিকা বালি হইতে চিনি পৃথক্ করিয়া লয়, তেমনি সম্বিৎ

(consciousness) বিচিত্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে জড়িত থাকিলেও আমরা তাহাকে সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখিতে পারি। পিপীলিকা মন্ত্র-গুণে কিছু-আর বালি হইতে চিনি বিবক্ত করে না— চিনির আঘ্রাণ এবং স্বাদ পাইয়াই তাহাকে বালি হইতে বিবিক্ত করে। আমরা কি লক্ষণ দৃষ্টে সম্বিৎকে তাহার শব্দস্পর্শাদি উপরাগ-সকল হইতে বিবিক্ত করি? পঞ্চদশী বলিতেছেন "ঐকরূপ্যাৎ" একরূপতা দৃষ্টে। বিষয়-সকল অনেকরূপ—সম্বিৎ একরূপা। বাহ্য-বিষয়-সকলের নানা জাতীয় বর্ণ, নানাজাতীয় শব্দ, নানাজাতীয় স্পর্শ, ইত্যাদি-প্রকার নানা লক্ষণ; কিন্তু সম্বিতের লক্ষণ একটিমাত্র;—কি? না সাক্ষিত্ব। ইহা ভিন্ন সম্বিতের দ্বিতীয় লক্ষণ নাই। একটা কলের পুতুল উঠিতেছে, বসিতেছে, শুইতেছে, বেড়াইতেছে, সবই করিতেছে অথচ সে তাহার কিছুই জানিতেছে না। আমরা উঠি, বসি, দাঁড়াই, কথা কই, যাহা করি—তাহারই সঙ্গে একটা সাক্ষী লাগিয়া রহিয়াছে;--কে? না সম্বিৎ consciousness। আমাদের মনের সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে যদি একই সাক্ষী নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া না থাকিত তবে আমরা এক সময়ে যাহা ভাবি বা করি বা বলি তাহা অন্য সময়ে আমাদের স্মরণে উদ্বোধিত হইতে পারিত না। সম্বিতের সেই একমাত্র সাক্ষিতা-লক্ষণ দৃষ্টে জাগ্রৎকালে আমরা সম্বিৎকে ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ অর্থাৎ sensation, এই সকল নানা বিষয়ের সংশ্লেষ হইতে বিবিক্ত করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারি। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "তথা স্বপ্নে" স্বপ্নকালেও সেইরূপ। "অত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং" এখানে কিন্তু (অর্থাৎ স্বপ্ন-কালে) বেদ্য বিষয় সকল অস্থির কিনা অব্যবস্থিত, জাগ্রৎ কালে স্থির কিনা সুব্যবস্থিত। "তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ" স্বপ্ন কাল এবং জাগ্রৎকাল দুয়ের মধ্যে বিষয়-ঘটিত এইরূপ প্রভেদ।

"সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে" উভয় কালের সাক্ষীরূপা যে সম্বিৎ তাহা একই অভিন্ন। পঞ্চদশীর এই কথাটির প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় তবে তাহা এই যে, স্বপ্ন-কালের এবং জাগ্রৎকালের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যদি একই না হইত, তবে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদ্রাবস্থার কোনো স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহারো স্মরণে আবির্ভূত হইতে পারিত না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ" সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান অন্ধকার বোধ আবির্ভূত হয়---অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না এইরূপ স্মরণ হয়। স্মৃতি কিরূপ? না "সাচাববুদ্ধবিষয়া" অব-বুদ্ধবিষয়া—জ্ঞাত-পূর্ব্ববিষয়া। জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় কখনো স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। কমলা নেবুর গাছ দেখিবার সময় দর্শকের জ্ঞানে তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিল বলিয়াই পরে যেমন তাহা তাহার স্মরণে আবির্ভূত হয়, তেমনি সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এই জ্ঞানটি সুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাগিতেছিল বলিয়াই পরে তাহার স্মরণ হয় যে নিদ্রাবস্থায় আমি কিছুই জানিতেছিলাম না। "অববুদ্ধং তৎ তদা ততঃ।" অতএব সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার সুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্চদশীর প্রদর্শিত এই প্রমাণটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে, সুষুপ্তি-কালে সম্বিৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত থাকে বলিয়া তাহা যে তখন নাই এরূপ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা সমস্ত মনোবৃত্তির সাক্ষী রূপা একমাত্র সম্বিৎ যদি সুষুপ্তির সময় বাস্তবিকই না থাকিত তাহা হইলে তাহা সুষুপ্তির পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় নির-বচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়া আসিতে পারিত না। তাহা হইলে পূর্ব্ব দিনের

সম্বিৎ পরদিনে আসিতে না আসিতেই সুষুপ্তিরূপ দস্যুর হস্তে নিহত হইত। যখন তাহা নিহত হয় নাই, তখন তাহা অবশ্যই সুষুপ্তির আবরণের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ছিল; যখন বর্ত্তমান ছিল, তখন অবশ্য সাক্ষিরূপেই বর্ত্তমান ছিল—কেননা লবণের যেমন লবণত্ব—সম্বিতের তেমনি সাক্ষিত্বই আদি অন্ত এবং মধ্য। আমি যদি প্রথম দিন কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া তৃতীয় দিনে কাশীতে উপনীত হই তবে তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, আমি দ্বিতীয় দিন মাঝের পথে ছিলাম। তেমনি, একই অভিন্ন সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যখন কালিকের দিন হইতে আজিকের দিনে উপনীত হইয়াছে, তখন সমস্ত মাঝের পথে তাহা বর্ত্তমান ছিল ইহা কেহই অস্বাকার করিতে পারেন না;—বর্ত্তমান যখন ছিল—তখন সাক্ষীরূপেই বর্ত্তমান ছিল; কেন না অসাক্ষী সম্বিৎও যা—অমিষ্ট মধুও তা, আর, সোণার পাথর বাটীও তা—একই। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "সবোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ" সেই যে সুষুপ্তি-কালীন অজ্ঞান-অন্ধকার-বোধ তাহা অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ বিষয় হইতেই ভিন্ন, তা বই বোধ বোধ-হইতে ভিন্ন নহে—সম্বিৎ সম্বিৎ-হইতে ভিন্ন নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ কালের সুব্যবস্থিত বিষয়-সকলের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ, স্বপ্ন-কালের অব্যবস্থিত বিষয় সকলের সাক্ষিরূপা সম্বিৎ, এবং সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞানান্ধকারের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ—তিন বিভিন্ন সম্বিৎ নহে কিন্তু একই অভিন্ন সম্বিৎ। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিৎ তদ্বৎ দিনান্তরে।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একই সম্বিৎ যেমন একদিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহা দিনান্তরেরও সাক্ষী। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে একা কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। ইহার পরেই বলিতেছেন "ইয়ং আত্মা" এই সম্বিৎই আত্মা। পঞ্চদশীর এই কথাটি Hamilton বলিতে বলিতে রহিয়া গিয়াছেন। Hamilton বলিতে-ছেন—

The next term to be considered is conscious subject. And first what is it to be conscious? · ······This act is of the most elementary character ; it is the codition of all knowledge····· ·· I know, I desire, feel. What is it that is common to all these ? knowing & feeling & desiring are not the same, and may be distinguished. But they all agree in one fundamental condition. Can I know without knowing that I know ? can I desire without knowing that I desire ? can I feel without knowing that I feel ? this is impossible. Now this knowing that I know or desire or feel, this common condition of self-knowledge, is precisely what is denominated consciousness. Hamiltion এইরূপ সম্বিৎকে জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সাধারণ ভিত্তিমূল জানিয়াও সাহস করিয়া এরূপ কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই যে, সম্বিৎই আত্মা। প্রত্যুত তিনি বলিয়াছেন যে—

Though consciousness be the condition of all internal phenomena, still it is itself only a phenomenon ; and

therefore supposes a subject in which it inheres ;--that is supposes some thing that is conscious,—something that manifests itself as conscious। কিন্তু পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সেই যে something that is conscious, সেটা consciousness itself, সেটা সম্বিৎ স্বয়ং।

পঞ্চদশী Hamilton এর ন্যায় সম্বিৎকে আত্মার পরিবর্ত্তনশীল অবভাস মাত্র, phenomenon-মাত্র, বলেন নাই :—পঞ্চদশী সম্বিৎকে অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা ॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, একাকী কেবল স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। স্বয়ংপ্রভা শব্দের অর্থ কি? তাহার অর্থ বলিতেছি শ্রবণ করুন। দীপালোক যেমন আলোক তো আছেই, তা ছাড়া তাহা আপনার আলোকে আপনি আলোকিত অথবা যাহা একই কথা—আপনার আপনি আলোকয়িতা; এইরূপ, যেমন তাহা আলোক, আলোকিত এবং আলোকয়িতা তিনই একাধারে; তেমনি, সম্বিৎ—জ্ঞান তো আছেই, তা ছাড়া তাহা আপনি আপনার জ্ঞাত-আপনি আপনার জ্ঞাতা;—কেননা সম্বিৎ আপনার অজ্ঞাত-সারে কিছুই করে না—সম্বিৎ সর্ব্বদাই আপনার জ্ঞানালোকে বিরাজমান; সম্বিৎ স্বয়ম্প্রভা। মুখে বলিতেছি আত্মা, মনে ভাবিতেছি জড়পিণ্ডের ন্যায় একটা অজ্ঞান-পদার্থ অথবা আকর্ষণ-শক্তির ন্যায় একটা অন্ধ শক্তি--এরূপ ইতস্তত-ভাব আমাদের দেশীয় পুরাতন দর্শনকারদিগের ত্রিসীমার মধ্যে ঘেঁসিতে পাইত না। সাজানো কথা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। ভাবিবার সময় তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের সব দিক্

সমীচীন-রূপে ভাবিতেন; আর, প্রকাশ করিয়া বলিবার সময় তাঁহারা তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্টাপষ্টি অসঙ্কোচে বলিতেন; লোকে কে কি ভাবিবে—কে কি বলিবে—তাহার কোনো তক্কা রাখিতেন না। যিনি নিরীশ্বরবাদী তিনি একেবারেই নির্ঘাত কলিয়া দিলেন 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ঈশ্বরের প্রমাণ নাই; Mill পর্য্যন্ত এরূপ তীব্র কথা বলিতে সাহস করেন নাই। যিনি অদ্বৈতবাদী তিনি একেবারেই সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া বলিলেন "সোহহং"—জর্ম্মান দর্শন-কারদিগের প্রপিতামহ Spinoza এরূপ কথা বলিতে সাহস করা দূরে থাকুক্—ওরূপ কথা সহসা কাহারো মুখে শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যাইত! আপনারা শুনিলে অবাক্ হইবেন যে, গৌতমের প্রণীত ন্যায়-শাস্ত্রের গোড়াতেই দেবতা-বন্দনা হ'চ্চে "ওঁ নমঃ প্রমাণায়" প্রমাণকে নমস্কার করি। একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-দিগের কিছুই অসাধ্য নাই, তাঁহারা হয় তো বলিবেন যে "প্রমাণায়" অর্থাৎ যাঁহার প্রকৃষ্টরূপে মান আছে তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা যাঁহাকে সকলের আগে বন্দনা করা হয় তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা গণেশায়। নমঃ প্রমাণায় কিনা নমো গণেশায়! সে কথা যা'ক্! Hamilton বলিয়াছেন Consciousness জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা সমস্তেরই সাধারণ ভিত্তিমূল বটে —কিন্তু;—ইত্যাদি; কিন্তু পাতঞ্জলের গ্রন্থ মধ্যে এই যে একটি সূত্র আছে

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্যো বিকল্পঃ"

ইহার মধ্যে বটেও নাই কিন্তুও নাই। উহার অর্থ এই;—শব্দ উচ্চারণের পিছনে পিছনে যে এক প্রকার অর্থশূন্য জ্ঞান উদ্বোধিত হয় তাহারই নাম বিকল্প। সে কিরূপ? টীকাকার ভোজরাজ বলিতেছেন "যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপং ইত্যত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতিবৎ শব্দজনিতে জ্ঞানে যোহধ্যবসিতো ভেদস্তমিহা-বিদ্যমানমপি সমারোপ্য বর্ত্ততেহধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব

পুরুষঃ।” না যেমন, ‘চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ-লক্ষণ’ এই কথাটিতে দেব দত্তের কম্বলের ন্যায় পুরুষের মধ্যে এবং চৈতন্যের মধ্যে মিথ্যা একটা ভেদ আরোপিত হয়;—বাস্তবিক চৈতন্যই পুরুষ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ‘দেবদত্তের কম্বল’ বলিলে যেমন দেবদত্ত মনুষ্য এবং তাহার গায়ের কম্বল একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, এইরূপ বুঝায়, তেমনি “আত্মার চৈতন্য” এরূপ বলিলে বুঝায় যে, আত্মা যেন চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, চৈতন্যই আত্মা। পঞ্চদশী যাহাকে বলিতেছেন সম্বিৎ, যোগশাস্ত্রে তাহা প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ চেতনা শব্দের অর্থ টীকাতে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই :—

“বিষয়প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্‌চেতনা” বিষয়ের প্রতিকূলে অন্তঃকরণের অভিমুখে যাহার গতি, এমন যে চেতনা কিনা দৃক্‌শক্তি কিনা জ্ঞান-শক্তি বা ধীশক্তি, তাহাই প্রত্যক্ চেতনা। প্রত্যক্ শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ অন্তর্মুখী, ইংরাজি অনুবাদ subjective। ইউরোপীয় দর্শনের subjective এবং objective শব্দ-যুগলের অবিকল সংস্কৃত প্রতিশব্দ যদি আপনাদের কাহারো কখনো আবশ্যক হয়—তবে subjective-এর স্থলে প্রত্যক্ অথবা প্রতীচীন শব্দ এবং objective-এর স্থলে পরাক্ অথবা পরাচীন শব্দ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন—তাহাতে অভিপ্রেত অর্থের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। পঞ্চদশী এই প্রত্যক্ চেতনাকে—সম্বিৎকে—লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন “ইয়ং আত্মা” ইনিই আত্মা। প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিই আত্মা, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্যটি ইংরাজি ভাষায় অতীব সহজে এক কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে,—সে কথা এই যে, আত্মা is not a dead substance but a living intellegent power। যোগ-

শাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিও যা, আর, পঞ্চদশীর সম্বিৎও তাই, একই। পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ

মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥

এই যে সম্বিৎরূপী—সাক্ষীরূপী—আত্মা, ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ যেহেতু ইনি পরম প্রেমাস্পদ। আত্মা যে আপনি আপনার প্রেমাস্পদ তাহার প্রমাণ কি? না ''মা ন ভূবং হি ভূয়াসং ইতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে" "আমি না হই" ইহা কাহারো ইচ্ছা নহে "আমি হই" ইহা সকলেরই ইচ্ছা—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মা আপনি আপনার প্রেমাস্পদ। আত্মা শুধু যে আপনার প্রেমাস্পদ তাহা নহে—আত্মা আপনার পরম প্রেমাস্পদ। কিসে জানিলে? পঞ্চদশী বলিতেছেন "তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি অতস্তৎ পরমং" সে প্রেম আপনার জন্য অন্যেতে সঞ্চারিত হয়—অন্যের জন্য আপনাতে সঞ্চারিত হয় না—এই জন্য তাহা পরম শব্দের বাচ্য। পঞ্চদশীর এই কথাটির কিঞ্চিৎ টীকা আবশ্যক। আমাদের প্রতিজনের আপনার শরীরের প্রতি অথবা বিষয়-বিভবের প্রতি অথবা মান সম্ভ্রমের প্রতি যে, টান আছে তাহার আতিশয্য হইলেই তাহাকে আমরা বলি স্বার্থপরতা। কিন্তু এখানে সেরূপ গৌণ আত্মপ্রীতির কথা হইতেছে না, এখানে মুখ্য আত্মপ্রীতির কথা হইতেছে। আপনার সিন্ধুকের টাকাকে অথবা আপনার উদরকে যিনি আত্ম-তুল্য দেখেন—সেই টাকাকে বা উদরকে ভালবাসাই তাঁহার আত্মপ্রীতি; সেরূপ আত্মপ্রীতির কথা এখানে হইতেছে না; সম্বিৎ-রূপী আত্মার যে আপনার প্রতি আপনার প্রেম তাহাই এখানে আত্মপ্রেম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। টাকা কড়ি লইয়াই, মানাভিমান লইয়াই, মনুষ্যে মনুষ্যে অমিল হয়; কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা লইয়া কাহারো সহিত

কাহারো অমিল হয় না। অমিল দূরে থাকুক্—বিশুদ্ধ চেতনার আপনার প্রতি আপনার ভালবাসার ভিতরে সমস্ত জগতের প্রতি ভালবাসা সম্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ এই কথাটির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী তাহার পরেই বলিতেছেন "তেন পরমানন্দতাত্মনঃ" তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এ কথাটির তাৎপর্য্য আর একটু স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলা উচিত ছিল। যাহা পরম প্রেমাস্পদ তাহাই কি আনন্দ স্বরূপ? দেবদত্ত আমার পরম প্রেমাস্পদ হইলেও এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, দেবদত্ত বিষাদে ম্রিয়মান। মানিলাম যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ কিন্তু তাহা হইতেই কিছু আর এটা আসিতেছে না যে, আত্মা পরম আনন্দ-স্বরূপ। এ স্থলটিতে পঞ্চদশীর হইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ ওকালতি করিতে হইল। তুমি যদি আমার পরম প্রেমাস্পদ হও, আর, তোমাকে যদি আমি নিকটে পাই তবে অবশ্যই আমার আনন্দ হইবে। আত্মা যেমন আপনাকে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে, তেমনি আপনি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমাস্পদ বন্ধুর নিকটতম সহবাসে যেরূপ পরম আনন্দ হয়—আত্মা কখনই সে আনন্দে বঞ্চিত হইতে পারে না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধং পরব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে॥" এইরূপ যুক্তি-দ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মা সৎ চিৎ এবং পরমানন্দ; আত্মা যে সৎ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; দেখানো হইয়াছে যে, "মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥" মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—এক কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ

উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। সম্বিৎ অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, আর অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া তাহা সৎশব্দের বাচ্য। দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত তিন অবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সাক্ষীরূপে নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া থাকে। সম্বিৎ যেমন সৎ তেমনি চিৎ। আর, কিয়ৎপূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎই আত্মা, আর সেই আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ অতএব পরম আনন্দস্বরূপ। আত্মা যেমন সৎ, তেমনি চিৎ, তেমনি পরম আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং উভয়ের ঐক্য বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চদশী অতঃপর যাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ ইহাও সত্য, আর, আপনি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ইহাও সত্য; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহা আপনার নিকটে অপ্রকাশ থাকিতে পারে; অপ্রকাশ থাকিলে আত্মা আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়াও নিকটবর্ত্তী নহে। কাজেই সে অবস্থায়—অপ্রকাশ অবস্থায়—আত্মার আনন্দ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মনে কর যে, আমার বাড়ির ভিত্তিমূলে রত্নের খনি রহিয়াছে কিন্তু আমার নিকট তাহা অপ্রকাশ। তাহা আমার নিকটে প্রকাশ পাইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না; কিন্তু এখন আমি সে আনন্দে বঞ্চিত। একদিকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে আত্মা কিছু না কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাই কেহই এরূপ ইচ্ছা করে না যে, আমি যেন না থাকি, প্রত্যুত সকলেই এইরূপ ইচ্ছা করে যে, আমি যেন থাকি। আর একদিকে দেখা যায় যে, আত্মা যদি মনুষ্যের নিকটে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইত তবে তাহার বিষয়-স্পৃহা থাকিত না। কোহিনুর হস্তে পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াসী হয়। পরম আনন্দ হস্তে পাইলে কে অপর আনন্দের প্রয়াসী হয়? মনুষ্যের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ প্রকাশ

পাইলে মনুষ্য তাহারই আনন্দে ভোর হইয়া থাকিত—বিষয়-স্পৃহা তাহার মনের চৌকাট ডিঙাইতে পারিত না। কিন্তু মনুষ্য দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে—আত্মা তাহার পরম প্রেমাস্পদ অথচ তাহার বিষয়-স্পৃহা ভরপুর। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, আত্মা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। পঞ্চদশী তাই বলিতেছেন

"অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা।
অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥

"অভানে" অর্থাৎ অপ্রকাশে "ন পরং প্রেম" পরম প্রেম হইতে পারে না; "ভানে" প্রকাশে "ন বিষয়স্পৃহা" বিষয়ের প্রতি স্পৃহা হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের দুইই আছে;—যাহা কেবল প্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—আপনার প্রতি পরম প্রেম আছে; আর, যাহা কেবল অপ্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট স্পৃহা আছে;

"অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥"

অতএব আত্মার পরমানন্দতা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। সে কিরূপ? পঞ্চদশী বলিতেছেন

"অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥"

নানা সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আমার পুত্র যখন বেদ-পাঠ করিতেছে, তখন সেই সমবেত পাঠধ্বনির সঙ্গে আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনিও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। এ অবস্থায় আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমি শুনিতেছি তাহাতে আর ভুল নাই কিন্তু কোন্ ধ্বনিটি আমার পুত্রের কণ্ঠ-নিঃসৃত তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবেই হইতেছে যে, আমার সেই পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকাশ

পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ না পাইবার কারণ কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ভাণেঽপ্যভাণং ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥"

ভাণেঽপ্যভাণং অর্থাৎ প্রকাশেও অপ্রকাশ "ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে" প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্তই সম্ভবে। একেবারেই না থাকা স্বতন্ত্র, আর, প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ স্ফূর্ত্তি না পাওয়া স্বতন্ত্র। মনে কর সমান বলবান্ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠেলিয়া কেহ কাহাকেও নড়াইতে পারিতেছে না। নড়াইতে পারাই বলের লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা কেহ বলিতে পারেন না যে, দুই জনের কেহই যখন কাহাকেও নড়াইতে পারিতেছে না, তখন উভয়ের কাহারো শরীরে একবিন্দুও বল নাই। প্রকৃত কথা এই যে, দুই জনেরই শরীরে প্রভূত বল আছে—কেবল প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। ইহার কিয়ৎপরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনং।"

বেদপাঠের দৃষ্টান্ত স্থলে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত একত্রে পঠনই প্রতিবন্ধের হেতু—এখানে অনাদি অবিদ্যাই বিভ্রান্তির একমাত্র কারণ। তাহার পরে পঞ্চদশী মায়া এবং অবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এইরূপ;—

এ পারে জীব, ওপারে ঈশ্বর, মাঝখানে ঐশী শক্তির প্রভাব;— সেই প্রভাব অথবা যাহা একই কথা, প্রকৃতি, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন এই অর্থে তাহা মায়া শব্দের বাচ্য, আর তাহা জীবের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সংসারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায় এই অর্থে তাহা অবিদ্যা-

শব্দের বাচ্য। তাহার পরে পঞ্চদশী অবিদ্যার তিনটি অবান্তর-বিভাগ যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই ;—

(১) স্থূল শরীর—ইহা অস্থি মাংস মজ্জা প্রভৃতি ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত এবং ইহা জাগ্রৎকালে কার্য্যে ব্যাপৃত হয় ; (২) সূক্ষ্ম শরীর—ইহা বিজ্ঞানময় কোষ (intellectual function), মানোময় কোষ (animal function), এবং প্রাণময় কোষ (vital function), এই তিনের সঙ্ঘাত ; আর, ইহা স্বপ্নকালে স্থূল শরীর হইতে অবসৃত হইয়া স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয় ; (৩) কারণ শরীর—ইহার অপর নাম আনন্দময় কোষ এবং ইহা সুষুপ্তিকালে সমস্ত দুঃখ শোক হইতে অবসৃত হইয়া আরাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অবিদ্যার এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম অবান্তর-বিভাগাপ্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী বলিতেছেন

"যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥"

যেমন শর-গাছের বহিঃস্থিত পত্রাবরণের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ এক একটি স্তবক একে একে সরাইয়া অবশেষে তাহার গর্ভ হইতে নূতন কোমল পত্র উদ্ধৃত করা যায়, তেমনি ধীর ব্যক্তিরা স্থূল-সূক্ষ্ম-এবং-কারণ শরীর হইতে আত্মাকে উত্তরোত্তর-ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া পরব্রহ্ম হইয়া যা'ন। তাহার কিয়ৎ পরে পঞ্চদশী তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন

"জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীং।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তাং উচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা ॥"

তামসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া যে-ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ (material cause) এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা মায়া পরিগ্রহ করিয়া যিনি নিমিত্ত কারণ (efficient cause) তিনি তত্ত্বমসি বাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দের বাচ্য। ঐশীশক্তি বা মায়াকে পঞ্চদশী এইরূপ

দুই অবয়বে বিবিক্ত করিয়াছেন—প্রথম, নিমিত্ত কারণ—বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মায়া; দ্বিতীয়, উপাদান কারণ—তামসী মায়া। একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব জগতে প্রকাশ করিতেছেন; আর একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব সমস্তই একেবারে প্রকাশ করেন না—যথা-নিয়মে উত্তরোত্তর-ক্রমে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই প্রবর্ত্তিত নিয়ম। ঐশীশক্তিতে প্রকাশের স্ফূর্ত্তি এবং পূর্ণ-প্রকাশের প্রতিবন্ধক এই দুই অবয়বের প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রথমটিকে পঞ্চদশী বলিয়াছেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মায়া এবং দ্বিতীয়টিকে বলিয়াছেন তামসী মায়া। পঞ্চদশীর মতানুসারে, এইরূপ দ্বিমুখী মায়া-দ্বারা কিনা ঐশী শক্তি দ্বারা যিনি জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি তৎ শব্দের বাচ্য। এই গেল তত্ত্ব-মসি শব্দের তৎ। তাহার পরে আসিতেছে

> "যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাং।
> আদত্তে তৎপরং ব্রহ্ম ত্বংপদেন তদোচ্যতে॥"

"সেই পরব্রহ্ম যখন বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি ত্বং শব্দে অভিহিত হ'ন।" বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া অর্থাৎ রজোগুণ-প্রধানা মায়া—অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা যাহার মূল-গত ভাব হ'চ্চে রজোগুণ কিনা struggle for existence। এখানে পঞ্চদশী মায়াকে তিন অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) ঐশী শক্তির প্রভাব—যাহার মূলগত ভাব প্রকাশ; (২) ঐশীশক্তির নিয়ম—যাহা ঐশ্বরিক ভাবের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক; (৩) জীবের অভ্যন্তরে ঐশী শক্তির বিচেষ্টা—যাহার স্থূল দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে;—তাহা আর কিছু না—

Darwin যাহাকে বলেন struggle for existence। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীং
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

পরস্পর-বিরোধিনী এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, তমোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ এবং রজোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া জীব অবিদ্যার বশীভূত, এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া) এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। ইহার পরের শ্লোকে পঞ্চদশী আপনার চরম মন্তব্য কথাটি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; তাহা এই যে,

"সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদংময়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

"সেই এই কালিদাস" এই বাক্য হইতে সেই এবং এই ছাড়িয়া দিয়া যেমন সেই-এই-বর্জ্জিত কেবলমাত্র কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যবর্ত্তী ঐশীশক্তির প্রভাব যাহা এ-পারে জীবের অবিদ্যারূপে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ও-পারে ঈশ্বরের মায়া রূপে প্রকটিত হয়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। এই গেল অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। এখন যোগশাস্ত্রের প্রণেতা পাতঞ্জল জীবেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখা যা'ক্।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-বিষয়ে দিব্য একটি সূত্র বিন্যস্ত আছে ; তাহা এই ;—

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজং"

ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ" এই কথা বলিলেই হইত, তাহা না বলিয়া "ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত" এরূপ ঘুরাইয়া বলিবার তাৎপর্য্য কি ? বিশেষ একটু তাৎপর্য্য আছে ;—তাহা এই যে, জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব পরাকাষ্ঠা বিকসিত রহিয়াছে। "জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে" ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে, জীব যদিচ সর্ব্বজ্ঞ নহে, তথাপি তাহার জ্ঞান সাধন-দ্বারা ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্বের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। জীবে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ রহিয়াছে কিন্তু সে বীজের সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়া জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে। ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরিপূর্ণ বিকাশ-প্রাপ্ত বলিয়া তিনিই কেবল সর্ব্বজ্ঞ। টীকাকার ভোজরাজ ঐ সূত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ;—

"দৃষ্টা হি অণুত্বমহত্বাদীনাং ধর্ম্মানাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ" অণুত্ব মহত্ব প্রভৃতি (অর্থাৎ ছোটত্ব বড়ত্ব প্রভৃতি) যে কোনো ধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য সম্ভবে তাহারই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি কোথাও না কোথাও দেখা যায় ; কিরূপ ? না "যথা পরমাণৌ অণুত্বস্য আকাশে চ পরম মহত্বস্য" যেমন পরমাণুতে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি এবং আকাশে মহত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। "এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মাস্তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানা কচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি—যত্র চৈতে নিরতিশয়াঃ স ঈশ্বরঃ।" এইরূপ জ্ঞানাদি চিত্তধর্ম্ম যাহা কোথাও বা অল্প পরিমাণে, কোথাও বা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা অবশ্য কোথাও না

কোথাও পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে—যাঁহাতে জ্ঞানাদি ধর্ম্ম পরাকাষ্ঠা পূর্ণতাপ্রাপ্ত তিনিই ঈশ্বর।" "ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত" ইহার অর্থ এখন বুঝা গেল; তাহা এই যে, ঈশ্বরেতে যে জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান—জীবেতে সেই জ্ঞান বীজভাবে অবস্থিতি করিতেছে। পাতঞ্জলের এই সিদ্ধান্তটির উপরে যদি পঞ্চদশীর প্রদর্শিত ভাগত্যাগ-লক্ষণা (কি না বিবেক-পদ্ধতি analysis) প্রয়োগ করা যায়; অর্থাৎ জীব জ্ঞানের বীজ ভাব এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ-ভাব, এ দুই কথার উল্লেখ না করিয়া যদি "উভয়েরই জ্ঞান আছে" এই বৃত্তান্তটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা যায়, তবে তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, জ্ঞানের সত্তা-মাত্র জীবেশ্বরের ঐক্য-স্থান। পঞ্চদশী মূল সত্যের অন্বেষণে বাহির হইয়া সম্বিৎ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার খুবই বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে; কেননা জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই সত্যান্বেষণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। কিন্তু তিনি কেবল-মাত্র বিবেক-পদ্ধতি (ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে process of analysisকেবল-মাত্র সেই বিবেক-পদ্ধতি) অবলম্বন করিয়া চলাতে সম্বিতের নির্গুণ একত্বে (analytic unityতে) আটক পড়িয়া আরম্ভ-স্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কাণ্টের প্রদর্শিত analytic judgement এবং synthetic judgement দুয়ের প্রভেদ যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, বিবেক পদ্ধতি অনুসারে, analysis পদ্ধতি অনুসারে, জ্ঞানে যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে তাহাকেই কেবল মার্জ্জিত করা যাইতে পারে কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে না, জ্ঞানের আয়-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। পঞ্চদশী বিবেক-পদ্ধতির জলাশয়ে সম্বিৎকে স্নান করাইয়া তাহার গাত্র হইতে ঐশী শক্তির প্রভাব

মার্জ্জন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন;—এটা তিনি দেখেন নাই যে, সম্বিতের গাত্র হইতে অবিদ্যা মার্জ্জন করা যেমন আবশ্যক, বিদ্যা দ্বারা সম্বিতের পুষ্টি সাধন করাও তেমনি আবশ্যক। সম্বিৎকে যেমন স্নান করানো আবশ্যক, তেমনি তাহাকে আহার দান করাও আবশ্যক। মনকে এরূপ প্রবোধ দিলে চলিবে না যে, অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলার নামই বিদ্যা উপার্জ্জন করা; কেননা ইহা সকলেরই জানা কথা যে, মরীচিকায় জল-ভ্রম ঘুচিয়া গেলেও—অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও—মরীচিকা-সম্বন্ধে বিদ্যা-উপার্জ্জনের অনেক অবশিষ্ট থাকে। মরীচিকা দেখিলেই পথিকের জল-ভ্রম হয়; কিন্তু সে যখন দৃশ্যমান জলাশয়ের নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখে যে, কোথাও জলের নাম-গন্ধও নাই, তখন তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়—অবিদ্যা ঘুচিয়া যায়; অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও—মরীচিকা-বিষয়ে তাহার বিদ্যার কিছু মাত্র আয়-বৃদ্ধি হয় না। সে কেবল এইটুকু মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মরীচিকা জল নহে; তা বই—মরীচিকা যে, পদার্থটা কি, তাহা তাহার স্বপ্নের অগোচর। দৃশ্যমান জগৎ আমাদের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে তাহা তাহার স্বরূপগত ভাব নহে ইহা জানিতে পারা'র নামই অবিদ্যা ঘুচিয়া যাওয়া—ভ্রম ঘুচিয়া যাওয়া। আর সেই দৃশ্যমান জগতের অভ্যন্তরে ঐশীশক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে তাহা জানিতে পারা'র নামই বিদ্যা। তাই আমরা বলি যে, সম্বিৎ হইতে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত বিদ্যা দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্যক। Maxmuller কৃত kant দর্শনের অনুবাদের উপক্রমণিকায় এক-স্থানে এইরূপ লিখিত আছে;—

This is from one point of view the great truth of idealism, that the source of all direct knowledge is to be

found in consciousness; but from another latet anguis in herba (শেষের ভাগটা latin উহার অর্থ—snake lies hidden in the grass) অর্থাৎ বাহিরে দেখিতে ভাল কিন্তু ভিতরে মার প্যাঁচ রহিয়াছে;—সে মার প্যাঁচ কিরূপ তাহা তাহার পরেই প্রশ্নচ্ছলে ইঙ্গিত করা হইতেছে:—

Are our thoughts really so much in our power? or are we not rather in relation to them, conditioned and overruled by countless influences which have their source in the thought of our contemporaries and still more in that of antiquity? পাতঞ্জল বলিতেছেন and above all in that of ঈশ্বর? তিনি বলিতেছেন যে,

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সম্বিৎ হইতে অবিদ্যা ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে; পাতঞ্জল বলিতেছেন যে, তদ্ব্যতীত সম্বিৎকে বিদ্যা-দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে হইবে; এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। টীকাকার ভোজরাজ "ঈশ্বর প্রণিধান" কথাটির তাৎপর্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই;—ঈশ্বর-প্রণিধান কি? না "তত্র ভক্তি-বিশেষঃ" ঈশ্বরেতে বিশিষ্টরূপ ভক্তি। "বিশিষ্টমুপাসনং" বিশিষ্টরূপ উপাসনা "সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং" তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। "বিষয়-সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তি" বিষয়-সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর প্রতি নিবেদন করিয়া দেওয়া" "তৎপ্রণিধানং" ইহারই নাম প্রণিধান। পঞ্চদশী ঐশী শক্তির প্রভাবকে মিথ্যা মায়া-বোধে সম্বিৎ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে বলেন; পাতঞ্জল তাহা বলেন না;—পাতঞ্জল

পরম গুরু পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তির প্রভাবে পরিগঠিত হইয়া আত্ম-শক্তি উপার্জ্জন করিতে বলেন— প্রকৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব উপার্জ্জন করিতে বলেন। সাংখ্যমত এবং অদ্বৈত মতের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই স্থানটিতে। অদ্বৈত-বাদী প্রকৃতি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভ করিবার পরামর্শ দে'ন। সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতির অধীনতা হইতে যদি মুক্তি পাইতে ইচ্ছা কর তবে প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞানে আয়ত্ত কর। বাহিরের দুর্দান্ত প্রকৃতি উনবিংশ শতাব্দীর এত পোষ মানিল কিসে? উনবিংশ শতাব্দী সাংখ্যের ঐ বচনটি শিরোধার্য্য করাতে! উনবিংশ শতাব্দী যদি সেশ্বর-সাংখ্য পাতঞ্জলের বচন শিরোধার্য্য করিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিত, তবে অন্তরের প্রকৃতিও ঐরূপই তাহার পোষ মানিত। সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল বলেন যে, ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু; তিনি আবহমান কাল মনুষ্যমণ্ডলীকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাহারই গুণে মনুষ্য জ্ঞানী হইয়াছে; নহিলে, শুধু কেবল সম্বিৎ মাজাঘসা করিয়া কেহই বিদ্যা-উপার্জ্জনেও সমর্থ হয় না—প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভেও সমর্থ হয় না। পঞ্চদশীর গ্রন্থকারকে যদি তাঁহার দশ বৎসর বয়সে হিংস্রজন্তুরহিত, নানা সুখাদ্য ফল-বৃক্ষ শোভিত, একটি জনশূন্য উপ-দ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ এখনো যাহা তখনও তাহাই থাকিত কিন্তু তাহা হইলে তিনি পঞ্চদশী প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ সম্বিৎ-মাত্রই থাকিয়া যাইত—জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান মাত্রই থাকিয়া যাইত তথা হইতে তিনি একপদও জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। অতএব সম্বিৎকে যেমন মাজিয়া ঘসিয়া অবিদ্যা হইতে নির্মুক্ত করা আবশ্যক—তেমনি তাহাকে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত জনসমাজের সাধুসঙ্গের

প্রভাব দ্বারা, ঈশ্বরানুগৃহীত পুরাতন আচার্য্যদিগের উপদেশ দ্বারা এবং ঈশ্বরের উপাসনা-লব্ধ প্রসাদ সম্বল দ্বারা পরিপুষ্ট করা আবশ্যক। জ্ঞানের পরিশোধন যেমন আবশ্যক—পরিবর্দ্ধনও তেমনি আবশ্যক। শাস্ত্রের মতামত সংক্ষেপে বলিলাম; এখন তৎ তৎ বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝি তাহা দ্রুতগতি বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি। কেন না, আমার কাণের কাছে আমার সম্বিৎ ক্রমাগত ফুসলাইতেছে

"গতা বহুতরা ভ্রাতঃ স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।"

জীবেশ্বরের মধ্যে পাতঞ্জলের প্রদর্শিত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হইতে যাত্রারম্ভ করাই আমি শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি। গুরু যখন শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন, তখন তিনি দেয়ালকে জ্ঞানোপদেশ করেন না—আপনারই মতন একজন জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন। মনে কর যেন রসায়ণ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শিষ্য গুরুর নিকটে গমন করিলেন। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা গুরুও যেমন জানেন শিষ্যও তেমনি জানেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই জানেন যে, জল তরল পদার্থ। এই গোড়ার বিষয়টিতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই জ্ঞানের ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু এই গোড়ার ঐক্য স্বতন্ত্র, আর, শেষের ঐক্য স্বতন্ত্র। গোড়ার ঐক্য শিষ্যের যাত্রারম্ভ স্থান—শেষের ঐক্য শিষ্যের গম্য-স্থান। জলের মূল উপাদান সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব গুরু যেরূপ জানিতেছেন, শিষ্য যখন তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সেইরূপ জানিবেন, তখন গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে ইতিপূর্ব্বোক্ত গোড়ার ঐক্য ব্যতীত নূতনতর আর এক প্রকার ঐক্য আবির্ভূত হইবে। ইহাকেই আমি বলিতেছি শেষের ঐক্য। জল তরল পদার্থ এ বিষয়ে গুরুশিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্ব-হইতেই আছে; কিন্তু জলের মূল উপাদান অম্লজন এবং উদজন বায়ু; সেই দুই বায়ু উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে তাড়িত সঞ্চার করিলে

জল উৎপন্ন হয়; ইত্যাদি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিষয়ে গুরু-শিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্বে ছিল না—শিক্ষার পরিচালনা-দ্বারা তাহা নূতন আবির্ভূত হইল। এই শেষের ঐক্যই সাধনের বিষয়। গোড়ার ঐক্য সাধনের পূর্ব্ব হইতেই আছে। গোড়ার ঐক্য হইতে সাধক যাত্রারম্ভ করেন, এবং সাধন-দ্বারা শেষের ঐক্যে উপনীত হ'ন। যদি গুরুকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জ্ঞান ছাড়িয়া দেও, আর, শিষ্যকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জানিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দেও; আর, সেইরূপ রফার প্রস্তাবে যদি উভয়েই সম্মত হ'ন; তবে গোড়ার ঐক্য যাহা উভয়ের মধ্যে গোড়া হইতেই আছে, তাহাই থাকিয়া যায়—শেষের ঐক্য অনেক হাত জলের নিচে পড়িয়া যায়। গোড়া'র ঐক্যের নিজের বেশী কোনো মূল্য নাই। গোড়ার ঐক্যস্থানটির তখনই সার্থকতা হয় যখন শিষ্যের জ্ঞান সেইখান-হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া গুরুর উন্নত জ্ঞানের সহিত উত্তরোত্তর ক্রমশই ঘনিষ্ট ঐক্য-সূত্রে নিবদ্ধ হইতে থাকে। গুরু যদি একজন সামান্য পাঠশালার গুরু মহাশয় হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো পাঁচ বৎসরের মধ্যেই গুরুর সমস্ত বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে গুরু যদি একজন দেশবিখ্যাত মহা-পণ্ডিত হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিলেও তাঁহার বিদ্যার তল আঁকড়িয়া পা'ন না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুরু যেখানে অসীম মহান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, শিষ্য সেখানে কোনো নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই গুরুর জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার সহিত সমান হইতে পারিবেন না। মনুষ্য-মণ্ডলী ৩০।৪০ হাজার বৎসর ধরিয়া এই যে রাশি রাশি বিদ্যাধন নগর পল্লীর পুস্তকালয়ে স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে—তাহা সর্ব্বজ্ঞত্ব-ভাণ্ডারের এক কোণের

একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও যোগ্য নহে।" গোড়া'র ঐক্য সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে; প্রস্তর পাষাণ এবং উদ্ভিদের মধ্যে আছে; উদ্ভিদ্ এবং জীবের মধ্যে আছে; জীবজন্তু এবং মনুষ্যের মধ্যে আছে; মনুষ্য এবং দেবতাদিগের মধ্যে আছে; দেব মনুষ্য পশু পক্ষী তরুলতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর—সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না,—কেননা সমস্ত জগৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু মনুষ্য অনন্ত কাল জ্ঞান এবং কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ না হইলে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের শেষের ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে না। সম্বিৎরূপী জ্ঞান-জ্যোতি জীবেশ্বরের এবং সমস্ত জ্ঞানবান্ জীবের গোড়ার ঐক্য-স্থান ইহা আমি পঞ্চদশীর গ্রন্থকারের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমি এই আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না যে, সেই গোড়ার ঐক্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ঈশ্বরের মহান্ গম্ভীর জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার সহিত আমাদের জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার ঐক্য ক্রমশই ঘনীভূত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সহযাত্রীদিগের সহিত ঐক্য ঘনীভূত করিতে হইবে। আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী, তবে তাহার উত্তরে আমি এই বলিব যে, প্রথমতঃ জীবেশ্বরের মধ্যে গোড়ার ঐক্য সর্ব্বাবস্থাতেই অটল রহিয়াছে এবং অটল থাকিবে—এ বিষয়ে আমি অদ্বৈতবাদী। দ্বিতীয়তঃ জীবেশ্বরের মধ্যে শেষের ঐক্য কস্মিন্ কালেও ছিল না—এখনও নাই—এবং ভবিষ্যতেও সংঘটনীয় নহে; কেন না কোনো জীবই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ছিল না, হয় নাই, হইবে না। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতবাদী। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক জ্ঞানবান্ জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দের বীজ যাহা নিহিত আছে, তাহাই জীবেশ্বরের

গোড়া'র ঐক্যস্থান;—ঈশ্বরোপাসনারূপ ক্ষেত্রকর্ষণে এবং ঈশ্বরের প্রসাদ-রূপ বারি-বর্ষণে সেই বীজ উত্তরোত্তর ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে;—যতই বিকাশ পায়, সাধক ততই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য—জ্ঞানে উপলব্ধি করে—প্রেমে উপভোগ করে, এবং যত্নে আত্মসাৎ করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হয়। এইরূপে গোড়ার ঐক্য হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সাধক ঈশ্বরের সহিত গাঢ়-হইতে গাঢ়তর ঐক্যবন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়—উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে সমুত্থান করে—গভীর হইতে গভীরতর অন্তরে নিমগ্ন হয়। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ইহার উপরে যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, জীবেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিম্বপ্রতি-বিম্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌কৃত না হইলে কে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর-ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে, এবং যত্নে উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইবে? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড়-দ্বারা একমেটে করিলেন, এবং জীব-চৈতন্য-দ্বারা দোমেটে করিলেন। জীব-ব্যতিরেকে অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি—তাহা থাকা না থাকা দুইই অবিকল সমান। অতএব অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বাদ-বিতণ্ডা বাদে আমার মতের সারাংশ কি যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহা সংক্ষেপে এই:—

নিত্য সত্য পরমাত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।
জ্ঞানে দৃশ্য, প্রেমে ভোগ্য, যত্নে লভনীয়॥
তাঁহারে পূজিয়া, জীব, হৃদে করি ধ্যান,
সাধিয়া তাঁহার কার্য্য, লভয়ে কল্যাণ॥

অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় সমালোচনা।

আমার পূর্ব্বকৃত অদ্বৈত মতের সমালোচনা পাঠ করিয়া একজন শ্রদ্ধেয় প্রাচীন দর্শনবিশারদ পণ্ডিত তৎসম্বন্ধে আমাকে তাঁহার মনের কথা অতীব সরল ভাবে খুলিয়া বলিয়াছেন—সে কথা এই :—

"অদ্বৈতবাদিরা ব্রহ্ম হইতে চাহেন, এরূপ যাহারা বুঝে, তাহারা অদ্বৈতবাদের মর্ম্মজ্ঞ নহে—বিচার-মল্ল মাত্র। অদ্বৈতবাদীর মনের ভিতরে যে কথা থাকে তাহার একটি কথা এই

'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গো ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥'

ভেদ তিরোহিত হইলেও আমি তোমারই পরন্তু আমার তুমি নহ; সমুদ্রেরই তরঙ্গ – সমুদ্র তরঙ্গের নহে।"

এই উদ্ধৃত শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে তরঙ্গোপম জীবাত্মা সমুদ্রোপম পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ট ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইলেও 'সমুদ্র ব্যাপক এবং তরঙ্গ ব্যাপ্য—পরমাত্মা পূর্ণ এবং জীবাত্মা অপূর্ণ' এই যে দ্বৈতভাব, ইহা অপরিহার্য্য। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, অদ্বৈতবাদের ভিতরের কথা ব্যক্ত করিলেই তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে। একদিকে প্রাচীন অদ্বৈতবাদী এইরূপ সুস্পষ্ট বচনে আমার অভিপ্রেত দ্বৈতাদ্বৈত মতের পোষকতা করিয়াছেন; আর এক দিকে একজন নব্য অদ্বৈতবাদী * আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অজ্ঞাতসারে আমারই ঐ মতের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন

"দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহাকে পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদীরা তাহাকেই প্রকৃত আত্মলাভ বলিয়া থাকেন।"

---

* শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন এম এ বি এল্।

নব্য প্রতিবাদী দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না--আমি কিন্তু অদ্বৈত মতের প্রতিপাদক প্রধান একটি গ্রন্থে দেখিয়াছি যে, সাধকের জ্ঞান অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে

'স্বয়ং নশ্যেৎ জলে কতকরেণুবৎ'

আপনিও বিনষ্ট হয়—কি প্রকারে? না যেমন কতক-রেণু (অর্থাৎ নির্ম্মলী) জলের মলা বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনষ্ট হয়।

অদ্বৈতবাদীর এই 'বিনষ্ট হওয়া' অথবা 'বিলীন হওয়া' কথাটি প্রতিবাদীর মনঃপূত না হওয়াতে তিনি বিলীন হওয়াকে বিলীন হওয়া না বলিয়া আত্মলাভ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। প্রতিবাদীর মন বলিতেছে যে, বিলীন হইবার বাসনা অদ্বৈতবাদের একটি ক্ষত-স্থান, তাই তিনি আত্মলাভ-শব্দের পটি দিয়া সেই ক্ষতস্থানটি আব-রণ করিবার জন্য সমুৎসুক। প্রতিবাদী এক কারণে বিলীন হও-য়াকে বিলীন হওয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, আমি আর এক কারণে বিলীন হওয়াকে আত্ম লাভ বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। আমার পক্ষের কারণ এই যে, 'গোড়া হইতে আমার মনে এইরূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, বিলীন হওয়ার অর্থ আপনাকে লাভ করা নহে—বিলীন হওয়ার অর্থ আপনি লয় প্রাপ্ত হওয়া। প্রতিবাদী বলিতেছেন যে বিলীন হওয়ার অর্থ আত্ম-লাভ। তবে তাই সই! কিন্তু আমি আত্মলাভের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলি নাই;—বাদী যাহা বলে নাই, প্রতিবাদী কোমর বাঁধিয়া তাহার প্রতিবাদ করি-তেছেন, ইহারই নাম বাতাসের সহিত যুদ্ধ করা। আমি আত্ম-লাভের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, কোনো নব্য বৈদান্তিক যদি সভাসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, ব্রহ্মের সহবাসে নবজীবন পাইয়া আত্মলাভ করাই সাধকের মুখ্য সংকল্প, তবে আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রীতিগদ্গদ চিত্তে তাঁহার সহিত আনন্দে হস্তা-

লোড়ন করিব—বলিব 'কে বলিল তুমি আমার প্রতিপক্ষ—তুমি আমার পরম আত্মীয়।'

আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনার উপসংহার ভাগে আমি আমার স্বমতের তিনটি বিভিন্ন অবয়ব ভাগ ভাগ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার প্রথম দুইটি (অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ) আমার মতের অসম্পূর্ণ অবয়ব, তৃতীয়টি (দ্বৈতাদ্বৈতবাদ) আমার মতের পূর্ণাবয়ব। অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদই আমার সমগ্র মত; প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী। তা ছাড়া, অদ্বৈত-বাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি অদ্বৈতবাদী; দ্বৈতবাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত সেই অংশে আমি দ্বৈতবাদী। যে অদ্বৈতবাদ এবং যে দ্বৈতবাদ - দ্বৈতাদ্বৈত-হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা যোদ্ধার ছিন্ন-হস্তের ন্যায় নির্জীব শুষ্ক এবং অকর্ম্মণ্য। কেহ বলিতে পারেন যে, 'তোমার অভিপ্রেত মত দেখিতেছি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—তাহা না বলিয়া তুমি বলিতেছ 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ,' ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছু না—আমার বিবেচনায়, বিশিষ্টাদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে এ কথা সাধারণ পাঠকের অনেকে হয়তো না জানিতে পারেন এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিপদে পাঠককে ঐ কথাটি স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতের পরিবর্ত্তে দ্বৈতাদ্বৈত শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। তাহাতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, যেহেতু আমি আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনার পরিশিষ্ট ভাগে দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের তাৎপর্য্য সবিশেষ বিবৃত করিয়া বলিয়াছি; * এই-রূপ বলিয়াছি যে, একটা কাচের পাত্রে তেল আর জল একত্রে স্থাপন করিলে দুয়ের মধ্যস্থলে একটা চক্রাকৃতি রেখা সকলেরই প্রত্যক্ষ-

* পরিশিষ্ট ভাগটি বর্ত্তমান সংস্করণে অনাবশ্যক বোধে প্রকাশিত হয় নাই।

গোচর হয়। সে রেখাটিকে জলরেখা বলিব, কিম্বা তৈলরেখা বলিব? তেলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা তৈলরেখা, জলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা জলরেখা। চক্রাকৃতি রেখাটি যেমন তেল আর জলের মধ্যবর্ত্তী, কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি সেইরূপ কার্য্য এবং কারণের মধ্যবর্ত্তী। কারণের দিক্‌দিয়া দেখিলে তাহা কারণ, কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা কার্য্য। এই জন্য উৎপাদিকা শক্তি কারণের সহিত এক হিসাবে অভিন্ন, আর এক হিসাবে বিভিন্ন। তাহা অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন। প্রাচীন দর্শনকার দেখিলেন যে, 'অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন' এ কথাটা মুখে বলিবার সময় স্ববিরোধী শুনায় বটে, অথচ উহার যাথার্থ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন'ও না, পারিবেন'ও না; ইহা দেখিয়া তিনি শক্তির নাম দিলেন 'অব্যপদেশ্য'। 'অব্যপদেশ্য' কিনা যাহা আপনার মনে আপনি বুঝা যায় কিন্তু অন্যকে উপদেশ করা যায় না—ভাবিয়া বুঝা যায় কিন্তু বলিয়া বুঝানো যায় না। অতএব শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। উভয়ের মধ্যে যে হিসাবে ভেদ নাই, সে হিসাবে পরমাত্মাতে কোনো জাতীয় ভেদই নাই—স্বজাতীয় ভেদ নাই—বিজাতীয় ভেদ নাই—স্বগত ভেদ নাই; যে হিসাবে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে, সে হিসাবে পরমাত্মাতে সকল প্রকার ভেদই আছে; তাহার সাক্ষী—জড়জগতের সহিত ঈশ্বরের বিজাতীয় ভেদ; চিৎজগতের সহিত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ; আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ সকলের সহিত তাঁহার স্বগত ভেদ।

প্রতিবাদী যখন বিলীন হওয়াকে আত্মলাভ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তখন তিনি পঞ্চদশীর নির্গুণ অদ্বৈতবাদকে হেগেলের মতানুযায়ী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি পঞ্চদশীর

"পরমাত্মাদ্বয়ানন্দঃ পূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্‌ভূত্বা প্রাবিশৎ জীবরূপতঃ ॥"

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার এইরূপ অর্থ করিতেছেন যে, 'অদ্বয়ানন্দ পরমাত্মা স্বমায়া দ্বারা পূর্ণ হইয়া স্বয়ংই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন।' এ কথাটি কোন্ দেশের কোন্ শাস্ত্রের কথা তাহা জানি না কিন্তু ঐ শ্লোকের টীকাতে এইরূপ লিখিত আছে যে,

'পূর্ব্বং, সৃষ্টেঃ প্রাক্ * * * * পরিপূর্ণঃ পরাত্মা স্বমায়য়া, * * * স্বনিষ্ঠয়া মায়াশক্ত্যা, স্বয়মেব জগদ্ ভূত্বা, স্বয়মেব জগদাকারতাং প্রাপ্য, জীবরূপতঃ প্রাবিশৎ।'

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরিপূর্ণ পরমাত্মা আপনার মায়া-শক্তি দ্বারা জগদাকারতা প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চদশী যেখানে বলিতেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা মায়াদ্বারা জগদাকারতা প্রাপ্ত হইলেন, প্রতিবাদী সেখানে বলিতেছেন 'পরমাত্মা মায়া-দ্বারা পূর্ণ হইয়া জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন।' পঞ্চদশীর শ্লোকের এইরূপ অর্থান্তর ঘটাইবার তাৎপর্য্য কি আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর তিনি পঞ্চদশীর ঐ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া কএক ছত্র শ্লোক যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সহিত হেগেলের Thesis (স্থাপন), Antithesis (প্রতিযোগ), এবং Synthesis (সমন্বয়) এই তিন পক্ষের কি যে প্রসক্তি তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন, 'অদ্বয়ানন্দরূপ পরমাত্মা, এটা thesis; স্বমায়া দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ংই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন, এটা Antithesis। সেই জীব ভেদ-দৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বহুজন্ম ভজনা করে; এবং পরিশেষে বহুজন্মসঞ্চিত সাধনপরিপাকবলে তাহার আত্মবিচারে প্রবৃত্তি হয়; ক্রমে আত্মবিচার দ্বারা মায়াকৃত ভেদদৃষ্টি নিরুদ্ধ হইলে অভেদ-দৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়, এটা Synthesis।' (!)। প্রকৃত কথা এই ; –

অদ্বৈতবাদীর মতে দার্শনিক বিচারপদ্ধতির দুইটি পক্ষ—পূর্ব্ব পক্ষ এবং সিদ্ধান্ত পক্ষ। হেগেলের মতে দার্শনিক বিচার-পদ্ধতির তিনটি পক্ষ—স্থাপন পক্ষ, প্রতিযোগ পক্ষ, এবং সমন্বয় পক্ষ। অদ্বৈতবাদী বিবেক দ্বারা পূর্ব্ব পক্ষের সদসদাত্মক (অর্থাৎ সত্য মিথ্যা জড়িত) বচন হইতে তাহার অসদংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদংশ গ্রহণ করেন এবং তাহাই সিদ্ধান্তপক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। হেগেল স্থাপন-পক্ষ এবং প্রতিযোগ পক্ষ উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করিয়া উভয়ের অন্যোন্যাশ্রয়তা (অর্থাৎ পরস্পরাধীনতা) প্রতিপাদন করেন, এবং উভয়াত্মক তৃতীয় সত্য সমন্বয়-পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্বৈত-বাদীর অদ্বৈত—সমস্ত দ্বৈত ছাঁটিয়া ফেলিয়া অদ্বৈত; হেগেলের অদ্বৈত—সমস্ত দ্বৈত আত্মসাৎ করিয়া অদ্বৈত। অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত নির্গুণ অদ্বৈত—নির্বিশেষ অদ্বৈত—নিছক অদ্বৈত। হেগেলের অদ্বৈত সগুণ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত (অর্থাৎ দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈত)। অতএব ইহা স্থির যে, অদ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন হেগেলের চরম উদ্দেশ্য নহে—হেগেলের চরম উদ্দেশ্য দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়। প্রতিবাদীকে একদিকে যেমন আমরা দোষ দিই আর একদিকে তেমনি আমরা সাধুবাদ দিই। দোষ দিই এই জন্য যে, তিনি অদ্বৈতবাদের স্কন্ধে হেগেলের দ্বৈতাদ্বৈত মত চাপাইতে (নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গাত্রে হ্যাট্‌কোটের বোঝা চাপাইতে) চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাকে সাধুবাদ দিই এই জন্য যে, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত মতের পটি দিয়া অদ্বৈতবাদের ক্ষতস্থান আবরণ করিবার জন্য তৎপর হওয়াতে আপনার দয়ার্দ্রচিত্তের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হেগেলীয় দর্শনের লোহার কড়াই ভাজা চিবানো হেগেলকেই পোষায়—আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পাঠকবর্গের ভোজনার্থে সেই রাক্ষসের খোরাক পরিবেষণ করিয়া আমি তাঁহাদের আর অধিক

অপ্রীতি-ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। নিতান্ত যেখানে উল্লেখ না করিলেই নয় সেইখানে কাণ্ট্ এবং হেগেলের কথা একটু আধটু উল্লেখ করিব। প্রথমে অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী আত্মজ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতি, সাধারণ পাঠকের বোধোপযোগী করিয়া, যত সহজে পারি, প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মনে কর আমি চাসা ছিলাম, রাজা হইলাম। আমার বুদ্ধিকৃত যোগ-প্রণালী দ্বারা আমিত্বের সঙ্গে রাজত্বের ভাব সংযোজিত হইয়া 'আমি রাজা' এইরূপ জ্ঞান আমার অন্তঃকরণে উদ্বোধিত হইল। এখন বক্তব্য এই যে, এইরূপ রাজাভিমানী অহংজ্ঞান আত্মজ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে। আমিত্ব × রাজত্ব এই যে গুণীকরণ বা গুণ-যোজনা, ইহা বুদ্ধি দ্বারা কৃত হইয়াছে—সুতরাং ইহা বুদ্ধির ফল-স্বরূপ। কিন্তু আত্মা বুদ্ধির মূল স্বরূপ। আমিত্ব × রাজত্ব এইরূপ যুক্তি (কিনা যোজনা-ক্রিয়ার ফল) অন্তঃকরণে ফলিত হইলে তাহার নাম আমরা দিই 'অহংকার বা অহংকৃতি।' 'অহঙ্কৃতি' অর্থাৎ করিয়া তোলা অহং—যেমন রাজারূপে গড়িয়া তোলা অহং। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন—"আমিত্ব × রাজত্ব" যেন অহঙ্কার হইল—'আমিত্ব × চাসাত্ব" এটাও কি অহঙ্কার?" এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, চাসা বলে 'আমি চাস করি খাই—কারো কোনো তক্কা রাখি না', চোর বলে 'আমি কেমন প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া চুরি করিয়াছি', মূর্খ বলে 'বিদ্যা শেখা বৃথা পণ্ডশ্রম, আমি সে দিকে যাই না—আমি অর্থের চেষ্টায় ফিরি'। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ব-অভিমান অথবা অহংকার কেবল যে বড়লোকের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে—সকল শ্রেণীর লোকের অন্তঃকরণেই তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজত্ব করে। অতএব এটা স্থির যে,

আমিত্ব × রাজত্ব এইরূপ গুণ যোজনা বা গুণীকরণ = অহঙ্কার ;

আর, তাহার ফল="আমি রাজা" এইরূপ জ্ঞান=অহংজ্ঞান বা অহং-প্রত্যয়।

তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধিকৃত গুণ-যোজনার সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান অন্তঃকরণে ফলিত হয়। যেমন কাগজের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের গুণী-করণ ব্যতিরেকে কাগজই হয় না—তেমনি আত্মতত্ত্বের সহিত অপর কোনো একটি তত্ত্বের (যেমন রাজত্বের বা চাসাত্বের) যোগ ব্যতিরেকে অহংজ্ঞান হইতে পারে না। এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অহংজ্ঞান যৌগিক জ্ঞান যেহেতু তাহা বুদ্ধিকৃত গুণ-যোজনা হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈতবাদীরা এইরূপ যৌগিক অহংজ্ঞানকে আভাস-চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধি-কৃত যোজনা কার্য্যের (বা অধ্যারোপের) ফল-স্বরূপ অহংজ্ঞান বুদ্ধির মূলস্থিত অকৃত্রিম * আত্মজ্ঞানের আভাস-মাত্র—অন্তকরণগত প্রতি-বিম্ব-মাত্র—তাহা প্রকৃত আত্মজ্ঞান নহে। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃত আত্মজ্ঞান যৌগিক (synthetic) নহে, তাহা বৈবেচিক (analytic) অর্থাৎ বিবেক-দ্বারা উৎপাদনীয়। যৌগিক অহংজ্ঞান হইতে রাজত্ব চাসাত্ব পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব প্রভৃতি আহঙ্কারিক ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলাই অদ্বৈতবাদের বিবেক-পদ্ধতি। এই বিবেক-পদ্ধতির সোপান অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতবাদী বুদ্ধির এ-পারস্থিত আভাস-চৈতন্য হইতে বুদ্ধির ও-পারস্থিত কূটস্থ চৈতন্যে উপনীত হ'ন—বুদ্ধির ফলস্বরূপ অহং-প্রত্যয় হইতে বুদ্ধির মূলস্থিত আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হ'ন। জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ কাণ্ট্ উপরি-উক্ত সমস্ত কথাই স্বীকার করেন; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন কূটস্থ চৈতন্য, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন

---

* যাহা কৃত—করিয়া তোলা—গড়িয়া তোলা (যেমন আমিত্ব+রাজত্ব=আমি রাজা) তাহারই নাম কৃত্রিম।

Pure self-consciousness অথবা pure apperception ; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন আভাস চৈতন্য, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন empirical self-conciousness ; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন অন্তঃকরণ, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন internal sense। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, কূটস্থ চৈতন্য আভাস-চৈতন্যরূপে অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হন। কাণ্ট্ বলেন যে, pure self consciousness internal sense এ empirical self-consciousness রূপে প্রতিফলিত হয়। অদ্বৈত-বাদী বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান বিবেকোৎপন্ন (সংক্ষেপে বৈবে-চিক) ; কাণ্ট্ বলেন Pure self consciousness analytic। কাণ্ট্ এবং অদ্বৈত-বাদীর মতে প্রভেদ তবে কি ? প্রভেদ আর কিছু না - বৈবেচিক জ্ঞানের প্রতি কাণ্টের মূলেই শ্রদ্ধা নাই—অদ্বৈত-বাদীর তাহার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। কাণ্ট্ বলেন যে, যৌগিক অহম্প্রত্যয় হইতে রাজত্ব চাসাত্ব পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব প্রভৃতি সমস্ত ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট থাকে কেবল-মাত্র 'আমি=আমি', 'আত্মা=আত্মা'। আত্মজ্ঞান চতুর্দ্দিকের জঞ্জাল হইতে পরিমার্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু তাহার ফল হইল -'ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল'। কেন না বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান অপর কোনো কিছুর সহিত যোগযুক্ত হইয়া অহংজ্ঞান রূপে প্রতিফলিত না হইলে— 'আমি' বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সুতরাং 'আমি=আমি' আর x=x, এ দুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। অদ্বৈতবাদী কাণ্টের এ কথা যে, অস্বীকার করেন তাহা নহে ; অদ্বৈতবাদী খুবই তাহা স্বীকার করেন—স্বীকার করিয়াও তিনি বলেন যে, বাক্য-মনের অতীত X=X প্রাপ্ত হইলে জীব যদি জন্ম-মৃত্যুর দায় হইতে চিরকালের মত অব্যাহতি পাইতে পারে, তবে তাহাই জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে হেগেল যাহা

বলেন তাহা আমি হেগেলীয় চুল-চেরা ভাষায় হেগেলোচিত সূক্ষ্ম-প্রণালীতে বলিতে সাহস করি না; দৃষ্টান্তের দু-পুরু কাচের মধ্য-দিয়া—মোটামুটি রকমে—ইঙ্গিত ইসারায়—তাহার কথঞ্চিৎ আভাস-মাত্র প্রদান করিতেছি। ইহাতে যদি পাঠক সন্তুষ্ট না হইয়া হেগেলের সহিত সবিশেষ পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি হেগেলকে চেনেন না! নিতান্তই যদি তিনি হেগেলের নিজ মূর্ত্তির দর্শনাভিলাষী হ'ন, তবে তিনি দার্শনিক অস্ত্রশস্ত্রে রীতিমত সুসজ্জিত হইয়া হেগেলীয় দর্শন-মহারণ্যের গোলোকধাঁদায় প্রবেশ করুন—কিন্তু যেন সেই নিবিড় মহারণ্যের ভিতরে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতগতি ফিরিয়া আসিয়া না বলেন 'ত্রাহি মধু-সূদন! আমি আর ও দিকে না—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও!' মোটামুটি হেগেলের কথার ধরণ এইরূপঃ—

রাজাকে তুমি রাজত্ব-অভিমান ছাঁটিয়া ফেলিতে বলিতেছ—কিন্তু আমি তাহা বলি না। রাজাকে আমি বলি যে, তোমার রাজত্ব-অহঙ্কার পদার্থটা কি তাহা তুমি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ। তাহা হইলে দেখিবে যে প্রজা না থাকিলে তুমি রাজা হইতে পার না। প্রজা যদি চাস না করে তবে তোমার রাজত্ব কোথায় থাকে? অতএব তোমার প্রজা যেমন তোমার অধীন—তুমিও তেমনি তোমার প্রজার অধীন। তুমি এবং তোমার প্রজাবর্গ পরস্পরাধীন। তুমি তোমার প্রজাবর্গের প্রভু এটা আংশিক সত্য। সমগ্র সত্য এই যে, তুমি তোমার প্রজার প্রভুও বটে, দাসও বটে। শেষোক্ত সত্যটির উপরেই তোমার স্বাধীনতা নির্ভর করে—যথেচ্ছাচারিতার উপরে নহে। তোমার প্রজা যদি তোমার আপনার হয়, আর তোমার সেই আপনার প্রজার যদি তুমি অধীন হও, তবে তুমি আপনারই অধীন হও—স্বাধীন হও। তোমার হাত যেমন তোমার আপনার—তোমার

প্রজাবর্গ তেমনি তোমার আপনার ; আর, আপনার হাতের আঙ্গুল যেমন আপনার আঙ্গুল, তেমনি আপনার প্রজাবর্গের অধীনে অবস্থিতি আপনারই অধীনে অবস্থিতি—তাহা স্বাধীনতা ; তাহা পরের অধীনে অবস্থিতি নহে—তাহা পরাধীনতা নহে। অতএব তুমি আপনার হাতকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না ; যথেচ্ছাচার দ্বারা প্রজাবর্গকে আপনার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না—তাহাদিগকে পর করিয়া ফেলিও না। স্নেহ-বন্ধন দ্বারা প্রজাবর্গকে আপনার করিয়া লও—আপনার করিয়া লইয়া সেই তোমার আপনারই প্রজা-বর্গের অধীন হও, তাহা হইলে তুমি আপনারই অধীন হইবে—স্বাধীন হইবে। স্বাধীনতার অভ্যন্তরে প্রভুত্ব এবং অধীনতা এই দুই বিরোধী পক্ষ প্রেম-সূত্রে গ্রথিত হইয়া একাধারে অবস্থিতি করে—বাঘে গরুতে একত্রে জলপান করে। কেননা 'আপনি আপনার অধীন' বলিলেই আপনি আপনার প্রভু বুঝায় ; স্বাধীন বলিলেই স্বপ্রভু বুঝায় ; স্বাধীনতার অভ্যন্তরে প্রভুত্ব এবং অধীনতা উভয়ে সদ্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বাস করে। * মনে কর এক-

---

* উল্লিখিত দৃষ্টান্তটির মধ্যে একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মনে কর আমি একটি বনকে উদ্যান-রূপে পরিণত করিতে সংকল্প করিলাম ; আর, সেই সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া লোক জন সমভিব্যাহারে বনাভিমুখে চলিলাম। এরূপ অবস্থায়, আমার সঙ্কল্পিত উদ্যান, যাহা ভবিষ্যতে বাস্তবিকরূপে ফলিত হইবে কিন্তু এখন কাল্পনিক মাত্র, তাহাই আমাকে বনাভিমুখে চালনা করিতেছে। তবেই হইল যে, আমি আমার আপনারই সংকল্পিত উদ্যান-দ্বারা চালিত হইতেছি—আপনারই কল্পনা দ্বারা চালিত হইতেছি ;—যখন আপনারই কার্য্য দ্বারা চালিত হইতেছি—তখন আমি আপনারই অধীন—স্বাধীন। যদি আমি পুষ্প-সৌরভের আকর্ষণে দিক্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া বনাভিমুখে চলিতাম তবে আমি পরাধীন হই-

জন নবাভিষিক্ত যুবরাজ হেগেলের এই অমাত্যোচিত সৎপরামর্শ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। হেগেল বলিলেন, 'কাঙ্গালের কথা বাসী

তাম। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—আমার উদ্যান-কল্পনা সর্ব্বাংশে মৌলিক নহে; তাহা পূর্ব্বদৃষ্ট উদ্যানের আংশিক অনুকরণ। সুতরাং উদ্যান-কল্পনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও আমার আপনার কার্য্য কিন্তু পরোক্ষ-সম্বন্ধে তাহা প্রকৃতির কার্য্য; এই জন্য আমরা বলি যে মনুষ্য যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বাধীন, তেমনি পরোক্ষ-সম্বন্ধে পরাধীন; তা বই, মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহে। আমার উদ্যান-কল্পনা কতক অংশে প্রকৃতির অনুকরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি অন্য কোনো কিছুর অনুকরণ নহে—তাহা একটি পরমাশ্চর্য্য মৌলিক ব্যাপার; ঈশ্বর কোনো অংশেই পরের অধীন নহেন—তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। স্বাধীনতা-শব্দের অর্থ আপনার অধীনতা self-determination। কিন্তু freedom শব্দের মুখ্য অর্থ অনধীন মুক্তভাব। অনধীন মুক্তভাব হইতে কোনো কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। আপনার অন্তর্নিহিত ভাবের এবং আপনার নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করা'র নামই স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করা। আর একটি কথা আছে—সেটি ধর্ম্মের অতীব একটি নিগূঢ় তত্ত্ব; সুতরাং এখানে অল্পের মধ্যে তাহার যৎসামান্য আভাস-মাত্র প্রদর্শন করাই সম্ভবে। সে কথাটি এই:—আমি যখন জানিতেছি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহি তখন সেই সঙ্গে এটাও জানিতেছি যে, ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন; জানিতেছি যে, আমার পরিমিত স্বাধীনতা ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। সাধক ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগী হইয়া আপনার প্রবৃত্তি-দমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-পথে চলিলে তাঁহার স্বাধীনতা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বিকসিত হইয়া ঈশ্বরের স্বাধীনতার নিকটবর্ত্তী হয়; আর যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ধর্ম্মসাধন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। একজন তার্কিক এস্থলে বলিতে পারেন যে, সমস্ত জগৎই যখন বাধ্যবাধকতার অধীন, তখন ঈশ্বরও যে সেরূপ নহেন তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যেখানে দুই বস্তু পরস্পরের

হইলেই ফলে' এই বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ আপনার নবাধিকৃত সিংহাসনের সুকোমল পৃষ্ঠাস্তরণে হেলান দিয়া "আমি মহারাজাধিরাজ" এইরূপ অহংকারে স্ফাত হইলেন—স্ফীত হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজা-বিদ্রোহের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। রাজার মনে নানা প্রকার কুটিল এবং জটিল দুশ্চিন্তা পর্য্যায়-ক্রমে আবির্ভূত হইতে লাগিল। এক দিন রাজার সভাপণ্ডিত কথকের বেদীতে আসীন হইয়া রাম-রাবণের যুদ্ধের উপসংহার ভাগ বর্ণন করিতে করিতে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।'

সে রাত্রে রাজার নিদ্রা হইল না। তিনি শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন "প্রজাবর্গ আমাকে যথেষ্ট কর প্রদান করে, প্রজাবর্গকে আমারও কিছু দেওয়া উচিত—রঘুবংশে পড়িয়াছি

'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ'।

সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার জন্য সূর্য্য পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করে। এ-হেন বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রজার হিতসাধন কার্য্যে—

বাহিরে অবস্থিতি করে সেইখানেই উভয়ের মধ্যে 'বাধ্যবাধকতার নিয়ম থাটে; পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যে বাধ্যবাধকতার নিয়ম থাটে। কিন্তু সমস্ত জগৎ যখন ঈশ্বরের ঐশী শক্তির উদ্ভাবনা - ঈশ্বরের বাহিরে যখন কিছুই নাই—তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ঈশ্বর কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতার অধীন নহেন—ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি তাহাই সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য—বাদ-প্রতিবাদ কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র; তাই আমি টিপ্পনী-চ্ছলে স্বাধীনতা সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

জন-সাধারণের সেবা-কার্য্যে—তৎপর হইলেন। এইরূপে তিনি রাজা হইয়াও বিবেক-দ্বারা আপনার প্রভুত্ব-অহঙ্কার হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া জন-সাধারণের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। ইহাই হেগেলের বিবেক পদ্ধতি! রাজা একদা প্রভূত রাজ-কার্য্য-ভারে অবসন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রজাবর্গের আমি কি এতই ক্রীতদাস যে, আমি তাহাদের সেবায় জীবন অবসান করিব! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হেগেল-মন্ত্রীর সে দিনকার সে কথা তাঁহার স্মরণাভ্যন্তরে আবির্ভূত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, আমার প্রজা আর কাহারো প্রজা নহে, আমারই প্রজা। তবে আমি তাহাদিগকে আপনার না ভাবিয়া পর ভাবি কেন? আমার হাতের আঙ্গুল, যেমন আমার আপনারই আঙ্গুল, তেমনি আমার প্রজাবর্গের সেবা আমার আপনারই সেবা, তাহা পরের সেবা নহে। আপনার প্রজাবর্গের সেবা করিলে আমি আপনারই সেবা করি—আপনি আপনার সেবক হই—আপনি আপনার অধীন হই, স্বাধীন হই। প্রজাও তেমনি মনে করুক্ যে, আমার আপনার রাজার অধীনে অবস্থিতি আপনারই অধীনে অবস্থিতি—পরের অধীনে অবস্থিতি নহে; তাহা স্বাধীনতা—তাহা পরাধীনতা নহে। প্রত্যেক মনুষ্য তেমনি মনে করুক্ যে, আমার প্রতিবাসী আমার আপনারই ভ্রাতা—আপনার ভ্রাতার সেবা করিলে আপনারই সেবা করা হয়, তা'বই পরের সেবা করা হয় না; সুতরাং তাহাতে স্বাধীনতাই প্রকাশ পায়—পরাধীনতা প্রকাশ পায় না। এইরূপ ভাবিয়া রাজা যথেচ্ছাচারি প্রভুত্বের সিংহাসন হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দাসত্বের বিনীত সোপানের মধ্য-দিয়া স্বাধীনতার দিব্য-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। স্বাধীনতা শুধু কেবল প্রভুত্ব নহে—শুধু কেবল অধীনতাও নহে; তাহা প্রভুত্ব এবং অধী-

নতা দুয়ের সমন্বয় হইতে উৎপন্ন 'যোগিনস্তৃতীয়ঃ পন্থা'; তাহার সাক্ষী—আপনি আপনার অধীন=আপনি আপনার প্রভু। ইহাই হেগেলের সমন্বয়-পদ্ধতি। সমন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুত্বরূপী বর এবং অধীনতা-রূপিণী কন্যা বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইলে সেই শুভ বিবাহের ফল হয় এইরূপ;—অধীনতার সংশ্লেষে প্রভুত্বের অযথা-অহঙ্কার ঘুচিয়া যায়, আর, প্রভুত্বের সংশ্লেষে অধীনতার অযথা দৈন্য ঘুচিয়া যায়; এই প্রকারে প্রভুত্ব এবং অধীনতা উভয়ে সুসংস্কৃত এবং সুসংহত হইয়া স্বাধীনতায় পরিণত হয়। পাঠক নিম্নে অবলোকন করুন্ঃ—

(১) আমিত্ব × প্রভুত্ব=আমি সর্ব্বেসর্ব্বা=অযথা অহঙ্কার।

(২) আমিত্ব × অধীনতা=আমি কিছুই নহি=অযথা অহংশূন্যতা।

(৩) আমিত্ব × অধীনতা × প্রভুত্ব=আমি আপনার অধীন=আমি আপনার প্রভু=স্বাধীনতা।

প্রথমটি অবিবেক-প্রধান অহঙ্কার; ইহা হেগেলের স্থাপন-পক্ষের অধিকারে, এবং অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষের অধিকারে, অবস্থিতি করে।

দ্বিতীয়-টি বিবেক-প্রধান অহংশূন্যতা; ইহা হেগেলের প্রতিযোগ-পক্ষের অধিকারে, এবং অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত-পক্ষের অধিকারে, অবস্থিতি করে।

তৃতীয়টি যোগ-প্রধান স্বাধীনতা; ইহা হেগেলের সমন্বয়পক্ষের অধিকারে অবস্থিতি করে; তদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদীর কোনো পক্ষেই অধিকার পায় না।

বিবেক-শব্দের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, তাহা বিবেচনা-ক্রিয়ার ফল; আর, আমরা যাহাকে সমন্বয় অর্থে গ্রহণ করিতেছি সেই যোগ-শব্দের গায়ে লেখা আছে যে, তাহা যুক্তি-ক্রিয়ার ফল।

অবিবেক হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে রাজার সেই-যে মনে হইয়াছিল যে, আমি আবার প্রভু কিসের—আমি প্রজাবর্গের অধীন ভৃত্য, সেটা তাঁহার বিবেচনা-কার্য্য, এবং তাহার ফল বিবেক। তাহার পরে রাজার মনে এই যে এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল যে, আমি প্রভুত্ব-অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দিয়াও প্রভুত্বে বঞ্চিত হইতেছি না; যেহেতু প্রজাবর্গ আমার আপনার—আমি আপনারই প্রজার অধীন—আপনারই অধীন, আপনি আপনার অধীন—আপনি আপনার প্রভু, প্রভুত্ব এবং দাসত্ব আমাতে নির্ব্বিরোধে অবস্থিতি করিতেছে—এটা হ'চ্চে তাঁর যুক্তি-কার্য্য; আর, যুক্তি-কার্য্যের (অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ যোজনা-কার্য্যের) ফল যোগ বা সমন্বয়। অতএব এটা স্থির যে, হেগেলের অভিপ্রায়ানুযায়ী যোগাত্মক স্বাধীন আত্মা, অদ্বৈতবাদীর বিবেকাত্মক X=X নহে। প্রতিবাদীর ন্যায় যাঁহারা যোগাত্মক স্বাধীন আত্মা এবং বিবেকাত্মক × = ×, এদুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়াও দেখেন না, যাঁহারা বিলীন হওয়াকেই আত্ম-লাভ মনে করেন, তাঁহাদের অযৌক্তিকতা-সম্বন্ধে Professor Andrew seth এই রূপ বলিয়াছেন "Comment would but weaken the audacious irony of phrases which make accomplishment tantamount to disappearence, and interpret 'gift' of personality as meaning the 'dissipation' of personality."

পঞ্চদশীতে ভাগত্যাগ-লক্ষণা-দ্বারা আত্মজ্ঞানে উপনীত হইবার যেরূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখিবা মাত্র পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা নিতান্তই একরোখা বিবেক-পদ্ধতি—তাহার মধ্যে সমন্বয়-পদ্ধতির নাম-গন্ধও নাই। যিনি কস্মিন্ কালেও কোনো অদ্বৈত-বাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থের মর্ম্মের ভিতরে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ

করিয়াছেন—নিশ্চয়ই তিনি আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, ভাগত্যাগ দ্বারা মায়া এবং অবিদ্যা একবার পরিত্যক্ত হইলে সেই পরিত্যক্ত অবিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত করিয়া লইবার বিধান নিতান্তই নূতন শাস্ত্র। অথচ প্রতিবাদী আমার নাম উল্লেখ করিয়া অম্লানবদনে বলিতেছেন যে, 'তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদীরাই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যে, ভাগত্যাগ দ্বারা ঐক্য প্রদর্শন করিতেছেন সেই পরিত্যক্ত ভাগ সমূহও অন্তর্নিহিত ঐক্যগ্রন্থিরই স্বভাব-সিদ্ধ পরিণাম?" ইহার উত্তরে আমি বলি যে, প্রতিবাদী কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদী সাংখ্যের ন্যায় পরিণামবাদী নহেন? তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদীর মতে অবিদ্যা জীবাত্মার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে? তিনি কি জানেম না যে, সেই ভ্রম বিনষ্ট হইলে অবিদ্যাবাদীর মতে আত্মা মুক্তি-লাভ করে? তিনি কি জানেন না যে, পরিত্যক্ত অবিদ্যা মুক্ত আত্মার ত্রিসীমার মধ্যেও ঘেঁসিতে পারে না? তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে বলিতেছেন যে, অদ্বৈতবাদীর মতে "পরিত্যক্ত ভাগসমূহ অন্তর্নিহিত ঐক্যগ্রন্থিরই স্বভাব-সিদ্ধ পরিণাম।" প্রতিবাদীর সহিত অনর্থক দ্বন্দ কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে আমার মত কিরূপ, আর, স্বদেশীয় শাস্ত্রের সহিত তাহার ঐক্যানৈক্যই বা কিরূপ, তাহা যত সংক্ষেপে পারি, প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। *

---

* পঞ্চদশীকার অদ্বৈতবাদের সমস্ত মূল কথাই তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অতীব পরিষ্কাররূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন—সে কথাগুলি এইঃ—(১) জীবাত্মার সচ্চিদানন্দতা। (২) জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। (৩) অবিদ্যার প্রভাব। (৪) সৃষ্টি-প্রকরণ। (৫) পঞ্চকোষ-বিবেক। (৬) ভাগত্যাগ লক্ষণা। (৭) শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। (৮) ধর্ম্মমেঘ সমাধি। (৯) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। (১০) অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

ঈশ্বর দ্বৈতাদ্বৈত মতের কেন্দ্রস্বরূপ। প্রকৃতি অরাবলী স্বরূপ। সূর্য্যের যেমন করাবলী, কেন্দ্রের তেমনি অরাবলী, আত্মার তেমনি আত্মপ্রভাব, পরমাত্মার তেমনি ঐশীশক্তি। প্রাজ্ঞ জীব-মণ্ডলী পরিধি-স্বরূপ, এবং এক একটি প্রাজ্ঞজীব এক একটি অরের বহিঃ-প্রান্ত স্বরূপ †। অরাবলী—কেন্দ্র এবং পরিধির পরস্পর ব্যবধান

পঞ্চদশীকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা চুম্বকাকারে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন। তেমনি আবার, প্রথম অধ্যায়ে তিনি পঞ্চ-কোষ-সম্বন্ধে যাহা চুম্বকাকারে বলিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হইতে পারে যে, পঞ্চদশীকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যাহা চুম্বকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—পর-পর-বর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিস্তারিতরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী অম্লান বদনে বলিতেছেন যে, "পঞ্চদশীর 'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্র বাবু সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক ছবি পাইলেন এ অতি আশ্চর্য্যের কথা। যদি তাহাই সম্ভব হইত, তবে পঞ্চদশীকার শেষ চতুর্দ্দশ অধ্যায় না লিখিলেও পারিতেন।" কোনো গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আপনার সমগ্র মন্তব্য কথাটি চুম্বকাকারে উপন্যস্ত করিয়া শেষ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবিস্তরে পরিস্ফুট করিলে তাঁহার সেরূপ কার্য্য বড়-যে-একটা অসম্ভব ব্যাপার তাহা বোধ করি কেহই বলিবেন না। তবে যে, প্রতিবাদী সম্ভবকে অসম্ভব মনে করিতেছেন, তাহা এক-প্রকার রজ্জুতে সর্পভ্রম—তাহার মূল কারণ প্রতিবাদ-প্রিয়তা রূপিণী অবিদ্যা!

† চক্রের পরিবর্ত্তে কুণ্ডলীর অথবা আবর্ত্তের উপমা দিলে আরো ঠিক হইত। কেননা কুণ্ডলীর বেষ্টনপথের যে কোনো স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া—একদিক্ দিয়া চলিলে আবর্ত্তমুখে-পতিত নৌকার ন্যায় উত্তরোত্তর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়—আর এক-

এবং বন্ধন দুয়েরই সম্পাদক;—প্রকৃতি একদিকে তমোগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব ঢাকিয়া রাখিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে ব্যবধান স্থাপন করে, আর একদিকে সত্ত্বগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে বন্ধন ঘনীভূত করে। সাংখ্যদর্শন কেন্দ্রকে গণনা হইতে বর্জ্জিত করিয়া অরাবলী এবং পরিধির উপরেই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; বেদান্ত-দর্শন অরাবলীকে মায়াবোধে তুচ্ছ করিয়া কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছেন—ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন একদিকে বলেন যে, জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় সমস্তই অচেতন প্রকৃতির কার্য্য—পুরুষ (জীবাত্মা) উদাসীন সাক্ষী মাত্র। আর এক দিকে বলেন যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ লৌহ এবং চুম্বকের মত পরস্পরের সান্নিধ্যবশতঃ পরস্পরের সমধর্ম্মিতার ভাণ করে। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ দুইভাবের দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। আমি যখন লিখিতেছি তখন আমার চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ আমার হস্ত কি ভাণ করে যে, সে নিজে লিখিতেছে? অন্ধ প্রকৃতি আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে—"আমি" কাহাকে বলে তাহাও সে জানে না—তবে কেমন করিয়া ভাণ করিবে যে, আমি

দিক দিয়া চলিলে কেন্দ্র হইতে উত্তরোত্তর দূরে পড়িতে হয়। চক্রের বেষ্টন-রেখাস্থিত বিন্দু সকল কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী, কিন্তু কুণ্ডলীর বেষ্টন-রেখাস্থিত বিন্দু সকলের মধ্যে কেহ বা কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে, কেহ বা অল্প দূরে অবস্থিতি করে। এই জন্য জীবগণের উত্তমাধম শ্রেণী-বিভাগ বুঝাইবার পক্ষে কুণ্ডলীর উপমা সবিশেষ উপযোগী। যাহাই হউক্—আমার বর্ত্তমান মন্তব্য কথা বুঝাইবার পক্ষে চক্রের উপমাই যথেষ্ট।

দ্রষ্টা? আর, তুমি যখন বলিতেছ যে, আত্মা উদাসীন সাক্ষী-মাত্র তা ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন তুমি আর এ কথা বলিতে পার না যে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিচলিত হইয়া আত্মা আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন। যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নির উত্তাপ বিচলিত করিবে কিরূপে? যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে সুস্বাদু অন্নের আঘ্রাণ বিচলিত করিবে কিরূপে? চুম্বকের সান্নিধ্য-বশতঃ লৌহ যখন বিচলিত হয়, আর কাষ্ঠ যখন বিচলিত হয় না, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, চুম্বকের প্রতি কাষ্ঠ উদাসীন—লৌহ আসক্ত। চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ বিচলিত হয় হউক্, কিন্তু কাষ্ঠ কেন বিচলিত হইবে? অতএব সাংখ্য যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়—আত্মা যদি একান্ত পক্ষেই নির্গুণ নিস্পৃহ নিরভিমানী উদাসীন সাক্ষী-মাত্র হ'ন তবে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানে লিপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কোনো প্রকারেই সম্ভব-পর নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা উভয়েরই মূলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্বীকার না করিলে উভয়ে যে কি সূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী, জীবাত্মা এবং প্রকৃতিকে, পরমাত্মার সহিত ভেদাভেদ-সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রকৃতিকে একেবারেই নস্যাৎ করিয়াছেন; এবং সেই-গতিকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে একীভূত করিয়া উভয়কে নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী এক দিকে বলেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ; আর এক দিকে বলেন যে তিনি মায়ারূপ উপাধিতে অধিরূঢ় হইয়া ঐশী শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যদি একান্ত-পক্ষেই শক্তিহীন হ'ন তবে তিনি কিরূপে মায়াতে অধিরূঢ় হইয়া সগুণ ব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত হইবেন; আর, যদি বল যে, গোড়া হইতেই

নির্গুণ ব্রহ্ম 'স্বগুণৈর্নিগূঢ়ং' আপনার গুণরাশির অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছেন, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে গোড়া হইতেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃত কথা এই যে, সগুণ ব্রহ্মই সমগ্র সত্য—নির্গুণ ব্রহ্ম বীজ সত্য। এ-পিট ও-পিট দুই পিট লইয়া একটা কাগজ হয়; তাহার মধ্যে আমি যখন এ পিটে লিখিতেছি—তখন এ পিটই দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা বলিতে পারি না যে, এই কাগজের এ পিট আছে কিন্তু ওপিট নাই; কেন না যদি ওপিট না থাকিত তবে এপিটও থাকিত না। ব্রহ্ম সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তি-সমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম। যদি জগৎ নাও থাকে তথাপি সেই মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও ব্রহ্মকে শক্তিহীন মনে করিতে পারি না—কেননা তখন স্বয়ম্ভু পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি করিতেছেন—এবং তাঁহার সেই আত্মশক্তিতে সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত।

সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরকে হারাইয়াছেন; বেদান্তদর্শন সাংখ্য হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন। সাংখ্য এবং বেদান্ত এই দুই দর্শনের দুই বিরোধী মতের সমন্বয় দ্বারা যেরূপ সগুণ দ্বৈতাদ্বৈতবাদে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে তাহাই আমি এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সাংখ্য দর্শন মূল প্রকৃতির নাম দিয়াছেন 'অব্যক্ত'; দৃশ্যমান প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্ত; সমগ্র প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্তাব্যক্ত। প্রকৃতির কার্য্য তিনরূপ—ব্যক্ত হওয়া, অব্যক্ত হওয়া, এবং ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করা। প্রকৃতির এই তিনটি কার্য্য দ্বারা তাহার তিনটি গুণ সূচিত হয়;—যেহেতু সাংখ্যের মতে কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন। ব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির ভিতরে সত্ত্ব-গুণ (প্রকাশ-গুণ, সত্তার অভিব্যক্তি-গুণ, বুদ্ধিবৃত্তি) বিদ্যমান আছে;

অব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে তমোগুণ (প্রকাশের প্রতিবন্ধক-জড়তা—মোহ) বিদ্যমান আছে; অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে রজোগুণ (প্রকাশের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, প্রাণ) আছে। ইহার মধ্যে আমার নিজের কথা একটিও নাই—আদ্যোপান্ত সমস্তই সাংখ্যের কথা। সাংখ্যশাস্ত্র হইতে রজস্তমোগুণ এবং বেদান্তশাস্ত্র হইতে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরতত্ত্ব আদায় করিয়া দুয়ের সমন্বয় পূর্ব্বক আমি আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনায় বলিয়াছি যে, ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। ঐশী-শক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম। 'নিয়ম' শব্দটি আমার নিজের মন হইতে উদ্ভাবন করি নাই; পাতঞ্জল-দর্শনের সাধন-পাদের ১৮ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকায় এইরূপ স্পষ্ট লিখিত আছে—

প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ (অর্থাৎ প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম);

ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ (প্রবৃত্তিরূপা ক্রিয়া রজোগুণের ধর্ম্ম);

স্থিতির্নিয়মরূপা তমসঃ (নিয়মরূপা স্থিতি তমোগুণের ধর্ম্ম) এখন আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই;—

ভূমি হইতে যখন উৎস উৎসারিত হয় তখন তাহাতে ভৌতিক নিয়মের অধীনতাই প্রকাশ পায়। রাজার অহঙ্কার হইতে যখন অত্যাচার উৎসারিত হয়, তখন তাহাতে অবিদ্যারই অধীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি ভৌতিক নিয়মেরও

অধীন নহে, অবিস্থারও অধীন নহে। জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি তাঁহার আপনারই নিয়মের অধীন। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় স্বীয় শক্তি বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপনার ভাব এবং আপনার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে, ঈশ্বর এক মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে তিনি কাহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিবেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে? শরীরের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্বিতীয়—সর্ব্ব জগতে তেমনি পরমাত্মা অদ্বিতীয়—সুতরাং দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহাকাশের ন্যায় অসঙ্গত। তবে কি ঈশ্বর আপনার সমগ্রভাব কোনো জীবাত্মার নিকটে প্রকাশ করিবেন? তাহা হইতে পারে না—যেহেতু ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে পারা অসম্ভব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, দুর্ব্বিপত্তি এবং অশান্তি হইতে শান্তির দিকে যথাক্রমে এবং যথানিয়মে লইয়া যাইতেছেন। অতএব জগতে অজ্ঞান থাকিবেই, পাপ থাকিবেই, অশান্তি থাকিবেই। কিন্তু আবার, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এমনি সর্ব্বজয়ী যে, অজ্ঞানকে দমন করিয়া জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—পাপকে দমন করিয়া পুণ্য উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—নানা প্রকার অশান্তি এবং উপদ্রব দমন করিয়া শান্তি উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই। কেননা ঈশ্বর আপনার ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ করিবার জন্যই আপনার অব্যক্ত শক্তিকে ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন। পৃথিবীতে ঐশ্বরিক ভাবের চরম অভিব্যক্তি কি? না জীবাত্মার বুদ্ধিস্থ জ্ঞানালোক; কেননা জগৎ হইতে জ্ঞানালোক অপসারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়। জ্ঞানালোকের প্রতিবন্ধক কি?

না তমোগুণ। তমোগুণ কি? না ঈশ্বরের আপনার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম—ঈশ্বরের হস্তের রাশ; কেননা ঈশ্বরের প্রকাশ স্ফূর্ত্তি ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তা বই, তাহা বাহিরের কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। এখন বেস বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বরের ঐশীশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা শব্দের বাচ্য হয় কেন? ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাত্মিকা, নিয়মাত্মিকা—তাই ত্রিগুণাত্মিকা।

পঞ্চদশী বলেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং মায়া-দ্বারা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর একদিকে আবার তিনি এবং আমাদের দেশের দ্বৈতাদ্বৈত সকল শাস্ত্র একবাক্যে বলেন যে, কর্ম্ম অনাদি। তবেই হইতেছে যে, কর্ম্মীও অনাদি—জীবও অনাদি; যেহেতু কর্ম্মীর আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ম্ম থাকিতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে ঈশ্বর জগতের অভ্যন্তরে জীব-রূপে প্রবেশ করা'তে তবে তো জীব আবির্ভূত হইল, তাহার পূর্ব্বে তো নয়! তবে আর জীব অনাদি কেমন করিয়া? কিন্তু বাসনা অনাদি, কর্ম্ম অনাদি, জীব অনাদি, এ কথা বলে না এমন শাস্ত্রই আমাদের দেশে নাই। সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, কর্ম্ম অনাদি সুতরাং জীবাত্মা অনাদি। এইখানে অদ্বৈতবাদীর দুইভাবের দুই কথা ধরা পড়িল:—

(১) ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে জীবরূপে প্রবেশ করিলেন।

(২) ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে জীবগণকে কর্ম্মফল বিতরণ করিতেছেন।

কাণ্টের দর্শনশাস্ত্রে (ঠিক্ ঐরূপ নহে কিন্তু) ইহারই অনুরূপ একটি দ্বিমুখী তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাণ্ট বলেন যে, মনুষ্যের

স্বাধীন পুরুষকার কার্য্য-কারণ প্রবাহের অতীত। কার্য্য-কারণ প্রবাহ এবং কালপ্রবাহ এ পিট ওপিট। সুতরাং মনুষ্যের স্বাধীন পুরুষকার একটি কালাতিগ তত্ত্ব। কিন্তু সেই স্বাধীন পুরুষকার দ্বারা যে কোনো কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় তাহা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অন্তঃপাতী সুতরাং তাহা একটি কালাশ্রিত ঘটনা। তাহা যখন কালাশ্রিত ঘটনা তখন তাহার কারণও কালাশ্রিত। তবেই হইতেছে যে, মনুষ্য-কৃত কার্য্যের কারণ দুইরূপ—কালাতিগ পুরুষকার এবং কালাশ্রিত বৈষয়িক প্রবর্ত্তনা। আমি যদি এক জনকে দশ টাকা দান করি—তবে সেই দান কার্য্যের কালাশ্রিত কারণ-পরম্পরা অনন্ত;—প্রথম কারণ আমার হস্ত; তাহার পশ্চাতে দ্বিতীয় কারণ সেই হস্তের পরিচালক ধমনী; তাহার পশ্চাতে তৃতীয় কারণ সেই ধমনীর নিয়ামক মস্তিষ্ক; তাহার পশ্চাতে চতুর্থ কারণ সেই মস্তিষ্কের পরিপোষক অন্ন; তাহার পশ্চাতে পঞ্চম কারণ সেই অন্নের উৎপাদক পৃথিবী, তাহার পশ্চাতে ষষ্ঠ কারণ সেই পৃথিবীর উৎপাদক সূর্য্য- ইত্যাদি। এই গেল দান কার্য্যের কালাশ্রিত কারণ পরম্পরা। তাহার কালাতিগ কারণ একটি বই নয়—কি? না কর্ত্তার পুরুষকার।

প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ প্রশ্নের বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই; কেননা দশ কোটি বৎসরই বল, আর, সহস্র কোটি বৎসরই বল—ব্রহ্মার তাহা এক দিনও নহে—এক পলও নহে—এক মুহূর্ত্তও নহে। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত এবং দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বের মুহূর্ত্ত দুয়ের মধ্যে আমরা যতটা প্রভেদ মনে করি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতারই পরিচয় প্রদান করে, তা বই তাহা বাস্তবিক সত্যের পরিচয় প্রদান করে না। ইউক্লিডের জ্যামিতিক

ভাষায় ভেদাঙ্কুর-গণিত differential calculus ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যেমন সুদুষ্কর, তেমনি কালিক ভাষায় কালাতিগ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো সুদুষ্কর। কিন্তু তাহা বলিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মনুষ্যের জ্ঞানের অগোচর নহে—মনুষ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একান্ত পক্ষেই বুঝিতে না পারে এমন নহে। তবে কি না, তাহা তলাইয়া বুঝিতে হইলে সাধনের নিতান্তই প্রয়োজন। সাধনের প্রণালী নূতন কোনো কিছু নহে, তাহা নানা শাস্ত্রে নানা রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ;—সমস্তের সমন্বয় দ্বারা আমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :—সাধন সোপানের তিনটি পংক্তি বা ধাপ ; (১) বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা অহংকার এবং বিষয়াসক্তি মন হইতে নির্ধূত করিয়া ফেলা সাধন সোপানের প্রথম পংক্তি। ইহা একরূপ আধ্যাত্মিক স্নান। ভৌতিক স্নান দ্বারা যেমন গাত্র-শুদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক স্নান-দ্বারা তেমনি চিত্ত-শুদ্ধি হয়। এইরূপ স্নানের অব্যবহিত ফল হয়—অন্তঃকরণে অহংকারের পরিবর্ত্তে দৈন্য, বিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য। তাহার পরে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণতা আত্মার অভ্যন্তরে প্রতীয়মান হয়। কেননা পরমাত্মার পূর্ণতা আদর্শরূপে সাধকের অন্তঃকরণে নিহিত আছে বলিয়া তাহারই প্রতিযোগে সাধক আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে। আতপের প্রতিযোগেই ছায়া-দৃষ্টি-গোচর হয় ; আর, বৃক্ষের তলস্থিত ছায়াই বলিয়া দেয় যে, বৃক্ষের মস্তকের উপরে সূর্য্যাতপ অবিষ্ঠান করিতেছে *। সাধকের বাসনাবর্জ্জিত অহংকার-

---

* All imperfect things must continually demonstrate the Perfect for the reason that they do not exist by reason of their defects but through what of truth

বর্জ্জিত দীন হীন এবং শূন্য হৃদয় আপনার অন্তরে পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার সংস্পর্শ উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মার দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। তাহার পরে সাধক সাধুসঙ্গ এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

(২) ধ্যানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে করিতে ক্রমশই সাধকের ঈশ্বর-প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হয়;—প্রীতির পরিপক্ক অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া এইরূপ কথা বাহির হয় যে,

"স এব প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং আর আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়। পরমাত্মাতে সাধকের প্রীতি সম্বন্ধ ঘনীভূত হইলে, আর তাঁহার ঈশ্বরকে পর বলিয়া মনে হয় না—আপনা হইতেও আপনার বলিয়া মনে হয়।

(৩) সাধকের ঈশ্বর-প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হইলে ঈশ্বরেতে তাঁহার আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা বলবতী হয়। তদনুসারে তিনি ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যথা-কর্ত্তব্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরকে তিনি আপনা হইতেও আপনার মনে করেন; এই জন্য ঈশ্বরের অধীনতাকে তিনি আপনারই অধীনতা মনে করেন—স্বাধীনতা মনে করেন। ঈশ্বর যদি তাঁহার 'পর' হইতেন তবেই তিনি ঈশ্বরের অধীনতাকে পরাধীনতা মনে করিতেন।

ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার

---

there is in them; and the imperfection is continually manifesting the want of the Perfect.

(একটি ইংরাজি দার্শনিক পত্রিকা-হইতে উদ্ধৃত)

অধীনে নিযুক্ত করার নামই অধ্যাত্মযোগ; এইরূপ অধ্যাত্মযোগেই আত্মার স্বাধীনতা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয়। এইরূপে (১) আধ্যাত্মিক স্নানানন্তর ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া, (২) ঈশ্বরের প্রেমামৃত রস-পান করিয়া, (৩) অধ্যাত্ম-যোগে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত উত্তরোত্তর উন্নতি-সোপানে আরোহণ করাই মনুষ্যের পরম-পুরুষার্থ। দার্শনিক মতামত বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, সাধক বিবেক দ্বারা দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে উপনীত হ'ন এবং অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদে উপনীত হ'ন। সাধক যখন সাধনের প্রথম সোপান হইতে (বিবেক-সোপান হইতে) দ্বিতীয় সোপানে (যোগ-সোপানে) পদনিক্ষেপ করেন তখনই দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ উভয়ে পরস্পরের সংশ্লেষে সুসংস্কৃত এবং সুসংহত হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পরিণত হয়।

অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩০৪।

অদ্বৈত মতের সমালোচনা।

মূল সত্য এক বই দুই নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সত্যের এই-রূপ মৌলিক একত্ব আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হই? তাহার চাবি আমাদের প্রতি জনের অন্তরে রহিয়াছে;—কি? না আত্মা। আপনাকে কেহই এক ছাড়া দুই বলিয়া জানিতে পারে না। আমরা আপন আত্মার আদর্শ অনুসারে অন্যের আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি; আর, তাহারই আদর্শ অনুসারে আমরা পরমাত্মার অসীম দেশকালব্যাপী মহান্ একত্ব উপলব্ধি করি। পরমাত্মার একত্ব এক দিকে যেমন আমরা আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করি, আর একদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বত্রই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আমরা দেখি যে সজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত জীবজন্তু এক ছাঁচে গঠিত; সজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত উদ্ভিদ একছাঁচে গঠিত। দেখি যে, উদ্ভিদ্ এবং জীব উভয়-শ্রেণীই একই প্রকার কতকগুলি মূল নিয়মের অধীনে জন্মগ্রহণ করে, বর্দ্ধিত হয়, বিকসিত হয় এবং বিলীন হয়। আরো সবিশেষ বিবরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, উদ্ভিদের বীজ যেমন গোলাকৃতি, জীবের অণ্ড তেমনি গোলাকৃতি, পৃথিবী গ্রহ চন্দ্রাদি বৃহদায়তন জড়পিণ্ড-সকল তেমনি গোলাকৃতি;—জড় উদ্ভিদ্ এবং জীবের আদিম উপাদান একই ছাঁচে গঠিত। আরো এই দেখি যে, জীবশরীরের সারভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-গোলিকার চক্রাকৃতি নাড়ীপথ, এবং আকাশ-গামী গ্রহচন্দ্রাদির অনাবৃত গতিপথ একই ছাঁচে গঠিত। আকাশে এ

যেমন একত্বের চক্রানুচক্র সর্ব্বত্রই ঘূর্ণায়মান দেখি, কালেও তাহাই দেখি; দেখি যে, বৎসরের দুই পক্ষ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, মাসের দুই পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ, দিনের দুই পক্ষ অহোরাত্র, ক্ষণের দুই পক্ষ নিশ্বাস-কাল প্রশ্বাস-কাল সকলই একই ছন্দে ঘূর্ণায়মান। এইরূপ যখন দেখি যে,অসীম দেশ কালের সমস্ত ঘটনা একই অপরিমেয় মহান্ কুলাল চক্রে পরিগঠিত হইতেছে, তখন আমাদের মনের অভ্যন্তরে আপনা হইতেই ধ্বনিত হইয়া উঠে - একমেবাদ্বিতীয়ং। কিন্তু ইন্দ্রিয়-মনের দ্বার দিয়া আমরা নূতন কিছুই দেখি না—আত্মা দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহারই প্রতিবিম্ব দেখি। আমার আত্মার আদর্শ অনুসারে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্ব স্থিররূপে উপলব্ধি করি, তাহারই আদর্শ অনুসারে তেমনিই স্থিররূপে সর্ব্বজগদ্ব্যাপী মহান্ আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি। আবার,আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা তোমার কার্য্যাদি দর্শনে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্বের পোষকতা পাই, তেমনি জগৎকার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমাত্মার মহান্ একত্বের পোষকতা পাই। ইহা ব্যতীত, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখেন যে, সমস্ত সৌর জগৎ একসময়ে সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল, সূর্য্য অন্তর-তর দ্বিতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল; দ্বিতীয় সূর্য্য আরো অন্তরতর তৃতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল;—এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন্ আদিকালে অন্তর হইতে অন্তরে কোথায় প্রবিষ্ট ছিল তাহার বাষ্পেরও সন্ধান কেহই বলিতে পারে না। আবার, আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন (যাঁহারা সাঁতার জানেন তাঁহাদের সোলা আবশ্যক হয় না, তেমনি তাঁহাদের দূরবীক্ষণ আবশ্যক হয় নাই—নিছক ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন) যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম সূর্য্যে সমস্ত বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড একীভূত ছিল। সে সূর্য্য জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতা পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি। সে শক্তি কল্পনা-চক্ষে দেখিতে গেলে এমনি সূক্ষ্ম যে, "নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ" "সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া" তাহা আছে কি নাই তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারা যায় না ;— কিন্তু জ্ঞান চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা যেমন মহা সূক্ষ্ম তেমনি তাহা মহা পরাক্রম-শালী ; —তাহা অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর অন্তঃসারে পরিপূর্ণ ;—তাহার ভিতরে জ্ঞান জাগিতেছে—প্রেম জাগিতেছে—ন্যায় জাগিতেছে—করুণা জাগিতেছে, অপরিসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে, সমস্তই তাহার অন্তর্ভূত। আমাদের দেশের কোনো পুরাতন মহর্ষি পরমাত্মার অতলস্পর্শ গভীর এবং অপরিমেয় মহান্ একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব ধ্যানে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি যখন হয় নাই,—যখন আর কিছুই ছিল না—অন্ধকারের অভ্যন্তরে অন্ধকার গূঢ় ছিল— তখন "আণীদবাতং" একাকী পরমাত্মার বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল। বায়ু-বিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস কবিতার পরাকাষ্ঠা কিন্তু তাহা কবিতা মাত্র নহে—তাহা অনির্ব্বচনীয় গভীর সত্য। মহাদেবের যোগাবস্থার বর্ণনা-কালে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং"

বৃষ্টির উপক্রম হয় নাই এমন জলদজাল, তরঙ্গ উঠে নাই এমন মহাসাগর ;—মনে কর বর্ষার প্রারম্ভে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন,—বৃষ্টির সমস্ত জোগাড় হইয়াছে কেবল তাহার পতন-মাত্র অবশিষ্ট ; সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গের সমস্ত পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে—কিন্তু সমুদ্র এখন স্থির! বৃষ্টি হয়-হয়—কিন্তু এখনো হয় নাই ; বৃষ্টির পতন এইরূপ হয় এবং নয়ের মধ্যে দোলায়মান। কারণকে আশ্রয় করিয়া

থাকা এবং কার্য্যে অভিব্যক্ত হওয়া এই দুয়ের মধ্যে কার্য্যোৎ-পাদিকা-শক্তির এই যে দোলায়মান ভাব—ইহাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উপমেয়। কঠিন প্রস্তরের মধ্যেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আর, তাহারই অদৃশ্য প্রভাবে সেই প্রস্ত-রের ক্রোড়-স্থিত বৃক্ষ-বীজ হইতে অঙ্কুর নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। "আনীদবাতং" "বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস" এই পুরাতন ঋষি বাক্য-টির অভ্যন্তরে কি অকথিত মহাপুরাণ জাগিতেছে—যাঁহার কবির কর্ণ তিনিই তাহা শুনিতে পা'ন। পরমাত্মার এইরূপ অসীম শক্তি-পরি-পূর্ণ গম্ভীর একত্ব, যাহা বেদোপনিষদে বহুধা গীত হইয়াছে, আমা-দের দেশীয় ভাষায় তাহার নাম সগুণ একত্ব এবং জর্ম্মান দেশীয় সুবিখ্যাত দর্শনকার কাণ্টের ভাষায় তাহার নাম Synthethic unity। গুণ-শব্দের মুখ্য অর্থ রজ্জু;—ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সমস্ত জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে

"স সেতু র্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"

লোকভঙ্গ নিবারণার্থে ঈশ্বর সেতু স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ ঈশ্বরের ঐশীশক্তি আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে তিন অবয়বে বিভক্ত—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। যেমন জড়ত্ব, এবং জড়তা এ দুই শব্দের অবিকল একই অর্থ, সত্ত্ব এবং সত্তা এ দুই শব্দেরও তাই। কালে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহা চিরকাল যাহা আছে তাহাই আছে, তাহারই নাম সৎ অর্থাৎ নিত্য সত্য। সেই সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু কালে প্রকাশিত হয় তাহাতে সেই সতের স্থায়িত্ব লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তে বলিয়া আমরা বলি যে তাহার সত্তা আছে অথবা সত্ত্ব আছে। সৎ অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আবির্ভূত হয় তাহা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তন-

শীল ঘটনাতে সতের প্রকাশও আছে—সত্বও আছে, প্রকাশের প্রতিবন্ধকও আছে—তমোও আছে, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার চেষ্টাও আছে--রজোও আছে। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব কতক অংশে প্রকাশ পাইতেছে যেমন—তেমনি প্রকাশের প্রতিবন্ধকও বর্ত্তমান আছে, আর, সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টাও বর্ত্তমান আছে; কেন না প্রকাশের যদি প্রতিবন্ধক না থাকিত তবে মুকুল এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ-বিকসিত পুষ্প হইয়া উঠিত; আর, যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত তবে মুকুল অল্পে অল্পে বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব যাহা কিয়দংশে প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকাশের ভাবই সত্ত্বগুণ, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই তমোগুণ; আর, সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই রজোগুণ। এ যাহা আমি বলিতেছি ইহা আমার ঘর গড়া কথা নহে। আমাদের দেশের পুরাণ তন্ত্র দর্শন সকলেই আমার ঐ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া একবাক্যে বলিতেছেন যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক; আর, তমোগুণ যে প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। শাস্ত্রে দুইরূপ কথা আছে; এক রূপ কথা ঐ যাহা বলিলাম,—কি? না সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক, তমোগুণ প্রতিবন্ধকতাত্মক। আর একরূপ কথা এই যে, সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজোগুণ দুঃখাত্মক, তমোগুণ বিষাদাত্মক অর্থাৎ অবসাদাত্মক। এ দুইরূপ কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা দুই কথা নহে—তাহা একই কথার এপিট ও পিট। মনে কর এক জন কবির মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা হাতে কলমে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার

সঙ্গে বিষাদের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতঃপর মনে কর যে, কবি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাঁহার মনের ভাব কায়ক্লেশে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা একটি কষ্টকর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পরে মনে কর যে, তিনি তাঁহার মনের ভাব সম্যক্ রূপে ব্যক্ত করিয়া সফল-মনোরথ হইলেন। ইহাতে তাঁহার কত না আনন্দ হইল! অতএব যাহা প্রকাশাত্মক তাহা সুখাত্মক, যাহা চেষ্টাত্মক তাহা দুঃখাত্মক, যাহা প্রতিবন্ধকতাত্মক তাহা বিষাদাত্মক—এ কথা খুবই সত্য। এতদ্ব্যতীত, শাস্ত্রের আর একটি কথা এই যে, সত্ত্বরজ এবং তমোগুণ জগতের আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তাহাদের কোনোটি কোথাও অপর দুইটির সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী অবস্থিতি করে না; তিন গুণ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে এবং এক এক বস্তুর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিমাণে মিলিয়া মিশিয়া এক সঙ্গে অবস্থিতি করে। জ্ঞানালোকের প্রকাশ—সত্ত্বগুণ - প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরের কথা; সে কথা তিনি জগৎ-পুস্তকের গোড়ার অধ্যায়ে অতীব অস্ফুট-রূপে ইঙ্গিত করেন মাত্র - শেষের অধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলেন। প্রকৃতির সেই যে অন্তরের কথা—সত্ত্বগুণ বা জ্ঞানালোক—প্রস্তর পাষাণাদিতে তাহার প্রকাশও যেমন অল্প, প্রকাশের চেষ্টাও তেমনি অল্প; এত অল্প যে নাই বলিলেই হয়। প্রস্তর পাষাণাদিতে প্রকাশের প্রতিবন্ধকতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই কারণে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রস্তর পাষাণাদি তমোগুণ-প্রধান। জীবজন্তুতে জ্ঞানালোকের প্রকাশ, আর, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক, দুয়েরই অপেক্ষা প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। সে চেষ্টার ভীষণ মূর্ত্তি যদি কেহ দেখিতে চা'ন, তবে Darwin তাহা খুবই বিসদ রূপে দেখাইয়াছেন;—কি? না Struggle for existence সত্তা-লাভের

জন্য প্রাণপণ উদ্যম। তাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে জীবজন্তু অপেক্ষাকৃত রজোগুণ-প্রধান। মনুষ্য নিতান্ত অসভ্য না হইলে জীবিকা-নির্ব্বাহ করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য্য মনে করে না—সভ্য-লোক মাত্রই জ্ঞান ধর্ম্ম সদ্ভাব এবং সদালাপের চর্চ্চা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করাকেই জীবনের প্রধানতম কার্য্য মনে করেন। মনুষ্য মণ্ডলীতে জ্ঞানালোকের এইরূপ প্রকাশাধিক্য দেখিয়াই শাস্ত্র-কারেরা মনুষ্যকে অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া-ছেন। সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণ ব্যক্ত প্রকৃতিতেও যেমন অব্যক্ত-প্রকৃতিতেও তেমনি (অর্থাৎ কার্য্যরূপী ব্যক্ত জগতেও যেমন; ঐশী-শক্তিরূপী অব্যক্ত জগতেও তেমনি) এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করে। নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনের মতে মূল প্রকৃতি এবং সেশ্বর দর্শনাদির মতে ঐশীশক্তি জগতের বীজ স্বরূপ। বীজেতে বৃক্ষের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই বর্ত্তমান আছে—অথচ তিনই অনভিব্যক্ত; মূল প্রকৃতিতে সেইরূপ জগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই অন্তর্ভূত রহিয়াছে—কেবল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ কোনোটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তিন গুণের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমনি সৌহার্দ্দ। যখন ব্যক্ত তখন তিনই ব্যক্ত—যখন অব্যক্ত তখন তিনই অব্যক্ত। যদি রাত্রি ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে (প্রতিক্রিয়া-সূত্রে) দিনও আসিবে সন্ধ্যাও আসিবে; যদি দিন ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা আসিবে রাত্রি আসিবে; যদি সন্ধ্যা ব্যক্ত হয়, তবে তাহার পিছনে পিছনে রাত্রি আসিবে দিন আসিবে। যদি ব্যক্ত না হইবার হয় তবে—না রাত্রি, না দিন, না সন্ধ্যা—কেহই ব্যক্ত হইবে না। শাস্ত্রেরও অভিপ্রায়ানুসারে সত্ত্বরজস্তমোগুণ, এইরূপ, ব্যক্ত

হইবার সময় তিনই ব্যক্ত হন; অব্যক্ত থাকিবার সময় তিনই মূল প্রকৃতিতে অথবা ঐশীশক্তিতে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। আমাদের দেশের বহুতর শাস্ত্র এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে ঈশ্বরের আদেশে জীবের ভোগ-মুক্তি-সাধনের জন্য মূল প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণাত্মক জগৎ অভিব্যক্ত হয়। আমাদের দেশের নানা শাস্ত্রের নানা বিরোধী মতের সমন্বয় করিয়া মোট কথা যাহা পাওয়া যায় তাহা এইঃ—ভগবদ্গীতায় আছে "একাংশেন স্থিতো জগৎ" ঐশীশক্তির একাংশে ভর করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে। * ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন;—মহা মহা সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকটেও তিনি একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না। ঐশীশক্তির প্রকাশ অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র-

---

* সে দিন ইষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে পাদ্রি হেণ্ডরসন সাহেবের একটি বক্তৃতায় দেখিলাম যে, তিনি বেদান্তের তত্ত্ব এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, এই যে জগৎ ইহাই ব্রহ্ম—তাহা ছাড়া ব্রহ্ম আর কিছুই নহেন—ইহাই বেদান্ত!!! ইহা তাঁহার জানা উচিত যে, বেদান্তের মতে জগৎ প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে—আর মায়া-মূলক এই যে দৃশ্যমান জগৎ ইহা কেবল ব্রহ্মের একাংশ মাত্র।—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার অর্থ এ নহে যে, "জগৎই ব্রহ্ম আর ব্রহ্মই জগৎ"। ইহার অর্থ এই যে, জগৎ কিছুই নহে, আর ব্রহ্মই জগতের সর্ব্বস্ব; যেমন তিনি জগতের সর্ব্বস্ব, তেমনি তিনি জগতের অতীত; সুতরাং জগৎকে ব্রহ্ম, উপলক্ষ-স্বরূপেই, বলা যাইতে পারে, আর, বেদান্তে তাহাই বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম শব্দের অর্থই এই যে, ব্রহ্ম জগতের পরপার। প্রায়শই পাদ্রি সাহেবেরা বেদান্ত না জানিয়া বেদান্তের মত খণ্ডন করিয়া থাকেন।

কারেরা তাহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত নিয়ম। তিনি অনিয়মিত রূপে, অযথাকালে, অযথা পাত্রে, আপনার ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না—ইহাই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। উপনিষদে আছে "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" যথা কালে, যথা পাত্রে, যেরূপ অর্থ বিধান করা তাঁহার সর্ব্বদর্শী মহাজ্ঞানের সহিত সঙ্গত তিনি সেইরূপ অর্থ সকল বিধান করেন। ত্রিগুণাত্মক শক্তির মূলাধার স্বরূপ ঈশ্বরের এইরূপ সগুণ একত্ব Synthetic unity স্বতন্ত্র, আর, অদ্বৈত মতানুযায়ী জীব- ব্রহ্মের একত্ব স্বতন্ত্র। শেষোক্ত একত্ব আমাদের দেশীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম নির্গুণ একত্ব, আর, কাণ্টের ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম analytic unity। আমি পরে দেখাইব যে, ঈশ্বরের সগুণ একত্ব Synthetic unity যাহা সমস্ত জগতের বন্ধন-স্বরূপ তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন সত্য এবং তাহাই সাধকের উপযুক্ত লক্ষ্যস্থান; আর, সেই সঙ্গে দেখাইব যে, নির্গুণ একত্ব analytic unity যাহা রাজ্যহীন রাজার সহিত অথবা আলোকবিহীন দীপের সহিত উপমেয়, তাহার পদবী উহা অপেক্ষা অনেক নিচু। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণ একত্ব কিরূপে সমর্থন করেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা আবশ্যক। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন

> "সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়ো
> স্ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা
> মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ
> অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥"

অর্থাৎ যেমন "সেই এই কালিদাস" এই কথাটির মধ্য হইতে 'সেই এবং এই' এই দুই বিরোধী ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র কেবল কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি তত্ত্বমসি এই বাক্যের মধ্য হইতে ত্বংশব্দ-সূচিত জীবের অবিদ্যা এবং তৎশব্দ-সূচিত ঈশ্বরের মায়া অর্থাৎ ঐশী শক্তি পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লক্ষিত হ'ন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—আমি যখন কালিদাসকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম তখন তিনি পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতেছিলেন, এখন দেখিতেছি যে, তিনি শকুন্তলা লিখিয়া মহাকবি হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম "সেই এই কালিদাস"। এই কথাটিকে দুই রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে;—এক এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এখন তিনি সেই কালিদাসই বটে কিন্তু তাহা-ব্যতীত এখন তিনি মহাকবি কালিদাস– এখন ব্যাকরণ সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার মন বোঝাই করা রহিয়াছে। কালিদাসের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি সম্বলিত এই যে একত্ব ইহারই নাম সগুণ একত্ব synthetic unity। "সেই এই কালিদাস" এই কথাটিকে অপর এইরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে তিনি মূর্খ ছিলেন এ কথা ছাড়িয়া দেও; আর, এখন তিনি মহা পণ্ডিত হইয়াছেন এ কথাও ছাড়িয়া দেও; দুই অবস্থার দুই কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ কেবল তিনি কালিদাস এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। এইরূপ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুই কূল-বর্জ্জিত কালিদাসকে কালিদাস বলাও যা আর খালিদাস বলাও তা—একই। কালিদাসের এই যে ফাঁকা একত্ব ইংরাজিতে যাহাকে বলে bare identity, ইহারই নাম নির্গুণ একত্ব analytic unity। শেষোক্ত দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, কালিদাস হইতে যেমন

তাঁহার পঠদ্দশা-সুলভ অজ্ঞানাবস্থা বাদ দেওয়া হইল, জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার জীবাবস্থা-সুলভ অবিদ্যা বাদ দেও; আর কালিদাস হইতে যেমন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা-সুলভ কবিতা-শক্তি বাদ দেওয়া হইল জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার পূর্ণাবস্থা-সুলভ ঐশী শক্তি বাদ দেও। এইরূপ জীবের পক্ষ হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের পক্ষ হইতে ঐশী শক্তি বাদ দিয়া কেবল মাত্র চৈতন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এইরূপ নির্গুণ একত্ব যাহা অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপাদন করেন তাহা ছাড়া বেদোপনিষদে আর-একরূপ একত্বের বহুতর উল্লেখ আছে—তাহার সাক্ষ্য "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" "তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন"; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ঈশ্বর-দ্বারা সমস্ত জগৎ আদ্যোপান্ত আচ্ছাদিত রহিয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্গুণ একত্ব এবং শেষোক্তরূপ সগুণ একত্ব দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মায়া এবং অবিদ্যা লইয়া বাচালতা করিতে আমাদের দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমান পটু; কিন্তু মায়া এবং অবিদ্যা শব্দের দার্শনিক তাৎপর্য্য কি তাহার প্রতি অতি অল্প লোকেই বিবেচনার সহিত প্রণিধান করেন। সকলেই জানেন যে, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম, মরীচিকায় জল-ভ্রম ইত্যাদি প্রকার ভ্রমই মায়া শব্দের বাচ্য। কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি এটা হয় তো না জানিতে পারেন যে, মায়া শব্দের মুখ্য অর্থ তাহা নহে। মায়া-শব্দের মুখ্য অর্থ ইন্দ্রজাল অর্থাৎ লোকে সচরাচর যাহাকে বলে জাদু। রামায়ণে আছে শূর্পনখা-রাক্ষসী মায়ামৃগ সৃষ্টি করিয়া সীতাকে ছলনা করিয়াছিল। এরূপ স্থলে মায়া-মৃগের উৎপাদিকা-শক্তি যাহা শূর্পনখার ইচ্ছাধীন তাহারই নাম মায়া; আর, সেই

মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সীতার যেরূপ ভ্রম হইয়াছিল সেইরূপ ভ্রমের নাম অবিদ্যা। সমস্ত জীবজন্তু চরাচর ঈশ্বরের ঐশী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ইহা দৃষ্টে পুরাতন কবিরা ঈশ্বরের ঐশী শক্তিকে ঐন্দ্রজালিকের মায়ার সহিত আর জীবজন্তু চরাচরের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞানকে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির ভ্রমের সহিত উপমা দিয়া জীবাশ্রিত সেই অজ্ঞানের নাম দিয়াছেন অবিদ্যা। একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী বিনা অবলম্বনে শূন্যে বিধৃত রহিয়াছে, অচেতন অণ্ডের আবরণ ভেদ করিয়া সচেতন জীব—সমস্ত সাজ সজ্জা পরিধান করিয়া বিনির্গত হইতেছে, এ সকল ঐশ্বরিক ব্যাপারের ন্যায় পরমাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল কে কবে কোথায় দেখিয়াছে! মায়া কথাটা পুরাতন কবিদিগের উক্তি—তাহা কবিতা-ভাবে গ্রহণ করাই উচিত। ঐ কবির উক্তিটিকে চলিত ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশী শক্তি। মহামায়া শব্দের অবিকল ইংরাজি অনুবাদ আর কিছু না—Great magical power। মায়া-শব্দের অর্থ ঐশী শক্তি এটা আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে; পুরাণাদিতে ঐ ভাবের ভূরি ভূরি কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পাছে লোকে ঈশ্বরের ঐশী শক্তিকে রাক্ষস এবং দৈত্যদিগের তামসিক মায়ার সহিত সমান মনে করিয়া ভ্রমে পড়ে, এই জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে ঐশ্বরিক মায়া, দৈবী মায়া, আসুরী মায়া, রাক্ষসী মায়া, এইরূপ মায়ার নানা প্রকার শ্রেণী-বিভাগেরও অপ্রতুল নাই। অতএব ঈশ্বরের মহতী শক্তির প্রভাবকে মায়া বলিলে অথবা জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ ভ্রম-প্রমাদ-মোহকে অবিদ্যা বলিলে অসত্য কিছুই বলা হয় না;—কেবল এইটি মনে রাখিলেই হইল যে, ঈশ্বরের মায়া আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী মায়া নহে; তাহা সত্ত্বগুণাত্মিকা সত্যময়ী মায়া। প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে চির-

কালই আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশে তাহাকে দৈবী মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা-হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। সঙ্গীত মহলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীচের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে শুনিতে যত কর্কশ লাগে—উপরের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে তত কর্কশ শুনায় না; এমন কি, প্রথম সপ্তকের সা'র সহিত যদি উপরিস্থ পঞ্চম সপ্তকের সা রে গা পা নি এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়, তবে ঐ সুরগুলি এমনি লপেট হইয়া একতানে মিলিয়া যায় যে, মনে হয় একটি মাত্র সুর সা একাকী ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের অভ্যন্তরে এ যেমন—সৃষ্টির অভ্যন্তরে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের এক একটি বিভিন্ন সুর হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া যতই উপরের সপ্তকের উপরের সুরে উত্থান করে, ততই সহযাত্রীদিগের সহিত একতানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের ভাব গ্রহণে এবং প্রেমরসাস্বাদনে সমর্থ হয়। অত-এব এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার জ্ঞানবান্ এবং হৃদয়বান্ জীবদিগের নিকটে ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত করিয়া প্রতিজনের অন্তঃকরণের যোগ্যতা অনুসারে তাহাকে আপনার অনুপম আনন্দের ভাগী করিবেন, ইহারই জন্য তিনি মনুষ্যকে আপন আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ঈশ্বরের মায়া করুণার প্রস্রবণ; তাহা আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী বিভীষিকাও নহে, আর, অর্থশূন্য প্রলাপ-বাক্যও নহে। মায়া কাহাকে বলে এবং অবিদ্যা কাহাকে বলে তাহা বলিলাম। মায়া কি? না ঈশ্বরের পরমা-শ্চর্য্য ঐশী শক্তি। অবিদ্যা কি? না জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞান। অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী নির্গুণ একত্ব কিরূপ তাহাও

পূর্ব্বে বলিয়াছি। পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, "সেই এই কালিদাস" এই বাক্যের মধ্য হইতে কালিদাসের প্রথম বয়সের মূর্খতা এবং দ্বিতীয় বয়সের কবিতা-শক্তি বাদ দিয়া যেমন কালিদাসের পরিবর্ত্তে খালিদাস পাওয়া যায়, তেমনি জীবের মধ্য হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের মধ্য হইতে ঐশী শক্তি বাদ দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই জীব-ব্রহ্মের নির্গুণ একত্ব। পাঠক যদি ধৈর্য্য ধরিয়া গন্তব্য পথে আমাদের সহিত শেষ পর্য্যন্ত চলেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, জীবেশ্বরের এই যে নির্গুণ একত্ব ইহা ঈশ্বরের সমগ্র একত্বের অনেক নিচের ধাপে অবস্থিতি করিতেছে। দেখিতে পাইবেন যে, এরূপ নির্গুণ একত্ব সাধকের প্রথম প্রয়াণ স্থান মাত্র, তা বই তাহা সাধকের চরম গম্যস্থান হইতে পারে না। এখন আমরা তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথমে জীবব্রহ্মের ঐক্য স্থানটি পঞ্চদশী যেরূপ পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিয়াছেন তাহা দেখাইব, তাহার পরে পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে জীবেশ্বরের মধ্যে যেরূপ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে তাহা দেখাইব। তাহার পরে তৎতদ্বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক ছবি কোথায় পাওয়া যায়, এ কথা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে। পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে অদ্বৈতমতের সার সিদ্ধান্ত যেরূপ সুন্দর দার্শনিক বিবেক-প্রণালী অনুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ-পারিপাট্য দেখিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সে বিবেক-প্রণালী আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে process of analysis। পঞ্চদশী প্রথমে জ্ঞানের সূর্য্যকান্ত মণিকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া

তাহা হইতে জ্যোতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; তাহার পরে সেই জ্যোতিকে সূর্য্য এবং সূর্য্যকান্ত মণির—পরমাত্মা এবং জীবাত্মার ঐক্যস্থান করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জীবের সেই যে আত্ম-জ্যোতি তাহা কি। পঞ্চদশী বলিতেছেন—'সম্বিৎ'। সম্বিৎ শব্দের ঠিক্ অর্থ যদি পাঠক জানিতে চা'ন তবে তাহা আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে consciousness। যদি বল "কোথা হইতে পাইলে?" তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সম্বিতের ঐ অর্থটি উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। লাটিন ভাষায় যাহার নাম con, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম সং। Con উপসর্গের ইংরাজি অনুবাদ with কিম্বা together with। সং উপসর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ সব সহিতে মিলিয়া; তাহার সাক্ষী—বেদের একস্থানে আছে "সম্বদধ্বং" এবং বেদ-ভাষ্যে উহার অর্থ এইরূপ লেখা আছে যে, 'সহ বদত' অর্থাৎ 'সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে বল'। সমষ্টি-বন্ধন বলিতে বুঝায় সং-অষ্টি-বন্ধন, সমস্ত এক সঙ্গে জড়ো করিয়া আঁটি বাধা। সমাহার বলিতে বুঝায় সং-আহরণ একত্র করিয়া আনা—সমস্ত কুড়াইয়া একত্রে জড়ো করা, ইংরাজিতে যাহাকে বলে summing up। সম্যক্‌রূপে কিনা comprehensively—এখানেও সং এবং con এ দুই উপসর্গের অর্থের মিল রহিয়াছে। একদিকে সং এবং con, আর এক দিকে বিদ্যা এবং science;—প্রথম দুটার মধ্যে যেমন অর্থ-সাদৃশ্য, শেষ-দুটার মধ্যে অর্থ-সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে। con-পূর্ব্বক scienceও যা, আর, সং পূর্ব্বক বিদ্যাও তা—একই। আমার সঙ্গে এত দূর আসিয়া এখন-আর এ কথা বলিও না যে, consciousness এবং সম্বিৎ বলিতে একই অর্থ বুঝায় না—কিনারায় আসিয়া নৌকা-ডুবি করিও না। তা যদি কর তবে আরেকটি কথা বলি শ্রবণ কর;—

কোনো ব্যক্তি মূর্চ্ছা গেলে আমরা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মতো বলি যে, এ ব্যক্তির চেতন নাই; কিন্তু একজন প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য সেরূপ স্থলে বলেন "এ ব্যক্তির সংজ্ঞা নাই", আবার, একজন নবীন ইংরাজিজ্ঞ ডাক্তার বলেন "এ ব্যক্তির consciousness নাই।" এস্থলে প্রবীণ এবং নবীন—বৃদ্ধ এবং অবৃদ্ধ—উভয়োর্ব্বচনং গ্রাহ্যং। অতএব সংজ্ঞা এবং consciousness এ দুই শব্দের অর্থ একই তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞা-ধাতুর অর্থও জানা, বিদ-ধাতুর অর্থও জানা—সংজ্ঞাও যা সম্বিৎও তা—একই;—প্রভেদ কেবল এই যে, সংজ্ঞা-শব্দ সাহিত্য-মহলে বেশী প্রচলিত—সম্বিৎ শব্দ দর্শন-মহলে বেশী প্রচলিত।

ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সুবিখ্যাত দর্শনকার Hamilton consciousness-শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সম্বিৎ শব্দ অবিকল সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। Hamilton বলিতেছেন—

In taking a comprehensive survey of the mental phenomena, these are all seen to comprise one essential element or possible only under one necessary condition. This element or condition is consciousness. In this knowledge they appear or are realized as phenomena, and with this knowledge they likewise disappear, or have no longer a phenomenal existence; So thal consciousness may be compared to an internal light, by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible" ইহার কিয়ৎ পরেই বলিতেছেন—

When I know, I must know that I know.—when 1

feel, I must know that I feel,—when I desire, I must know that I desire. The knowledge, the feeling, the desire, are possible only under the condition of being known. The expression I know that I know, I know that I feel, I know that I desire, are translated by, I am conscious that I know, I am conscious that I feel, I am conscious that I desire. Hamilton এই যাহা বলিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই যে, বিভিন্ন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সঙ্গে একই অভিন্ন জ্ঞান যাহা সাক্ষীরূপে লাগিয়া থাকে তাহারই নাম সম্বিৎ। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্
ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥"

শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয় সকল বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত (অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ কিনা consciousness তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। সে দিন আমার একজন বন্ধু আমার কৃত ততো এবং তৎ এই দুই শব্দের অর্থ শুনিয়া সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমি টীকা হাতড়িয়া দেখিলাম যে, আমি ঐ দুই শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছিলাম টীকায় অবিকল তাহাই লিখিত রহিয়াছে; ইহা দেখিয়া একদিকে যেমন আমার আনন্দ হইল আর এক দিকে তেমনি দুঃখ হইল;—দুখের কারণ এই যে, এমন বিসদ টীকা সত্ত্বেও পুঁথির উৎকৃষ্ট মূল বচনগুলির অর্থ নানালোকে নানারূপ করেন, অথচ প্রকৃত তাৎপর্য্যটি তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়। আমি যে, ঐ দুটা শব্দ প্রথম দেখিবা মাত্রই ও-দুটার ঠিক্ অর্থ ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের

বিষয় নহে, কেননা বিবেক, বিবেচনা, analysis, বলিয়া যে একটা দার্শনিক প্রণালী আছে তাহা তৎপূর্ব্বে আমার জানা ছিল, আর তাহা জানা বড় যে একটা বেশী বিদ্যার কার্য্য তাহাও নহে—বার-কত যাঁহারা ইংরাজি-দর্শনের পাত উল্টাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা জানেন। টীকায় স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে "ততো বিভক্তা" কিনা "তেভ্যো বিভক্তা" সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত। ততঃ শব্দের অর্থ তস্মাৎও হয় আর তেভ্যঃও হয়—এখানে ততঃ শব্দের অর্থ তেভ্যঃ কিনা সেই সকল বিষয় হইতে। "তৎসম্বিৎ" ইহার অর্থ ফস্ করিয়া পাঠক মনে করেন যে, সেই সম্বিৎ; কিন্তু টীকাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে তৎসম্বিৎ কিনা "তেষাং শব্দাদীনাং সম্বিৎ" সেই শব্দাদির সম্বিৎ consciousness of those sensations of sound &c। বিভক্ত শব্দের অর্থ টীকায় এইরূপ আছে যে, "বুদ্ধ্যা বিবেচিতা" অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত analysed by the understanding; Hamiltion প্রভৃতি যাহাকে বলেন distinguished but not separated। অতএব পঞ্চদশীর ঐ শ্লোকের অর্থ কিয়ৎপূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা তাহার অবিকল অনুবাদ। তাহা আর-একবার বলি শ্রবণ করুন। "শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ" শব্দস্পর্শাদি বেদ্য বিষয় সকল (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে sensations) "বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্" বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। ততো বিভক্তা তৎ সম্বিৎ" সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত (অর্থাৎ distinct) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ consciousness of those sensations, "ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে" তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। এইখানে বিবেচনা-পদ্ধতির বা বিবেক-পদ্ধতির হস্ত দেখা যাইতেছে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে analysis। যেমন বালির সঙ্গে চিনি মিশ্রিত থাকিলে পিপীলিকা বালি হইতে চিনি পৃথক্ করিয়া লয়, তেমনি সম্বিৎ

(consciousness) বিচিত্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে জড়িত থাকিলেও আমরা তাহাকে সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখিতে পারি। পিপীলিকা মন্ত্র-গুণে কিছু-আর বালি হইতে চিনি বিবক্ত করে না—চিনির আঘ্রাণ এবং স্বাদ পাইয়াই তাহাকে বালি হইতে বিবিক্ত করে। আমরা কি লক্ষণ দৃষ্টে সম্বিৎকে তাহার শব্দস্পর্শাদি উপরাগ-সকল হইতে বিবিক্ত করি? পঞ্চদশী বলিতেছেন "ঐকরূপ্যাৎ" একরূপতা দৃষ্টে। বিষয়-সকল অনেকরূপ—সম্বিৎ একরূপা। বাহ্য-বিষয়-সকলের নানা জাতীয় বর্ণ, নানাজাতীয় শব্দ, নানাজাতীয় স্পর্শ, ইত্যাদি-প্রকার নানা লক্ষণ; কিন্তু সম্বিতের লক্ষণ একটিমাত্র;—কি? না সাক্ষিত্ব। ইহা ভিন্ন সম্বিতের দ্বিতীয় লক্ষণ নাই। একটা কলের পুতুল উঠিতেছে, বসিতেছে, শুইতেছে, বেড়াইতেছে, সবই করিতেছে অথচ সে তাহার কিছুই জানিতেছে না। আমরা উঠি, বসি, দাঁড়াই, কথা কই, যাহা করি—তাহারই সঙ্গে একটা সাক্ষী লাগিয়া রহিয়াছে;--কে? না সম্বিৎ consciousness। আমাদের মনের সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে যদি একই সাক্ষী নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া না থাকিত তবে আমরা এক সময়ে যাহা ভাবি বা করি বা বলি তাহা অন্য সময়ে আমাদের স্মরণে উদ্বোধিত হইতে পারিত না। সম্বিতের সেই একমাত্র সাক্ষিতা-লক্ষণ দৃষ্টে জাগ্রৎকালে আমরা সম্বিৎকে ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ অর্থাৎ sensation, এই সকল নানা বিষয়ের সংশ্লেষ হইতে বিবিক্ত করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারি। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "তথা স্বপ্নে" স্বপ্নকালেও সেইরূপ। "অত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং" এখানে কিন্তু (অর্থাৎ স্বপ্ন-কালে) বেদ্য বিষয় সকল অস্থির কিনা অব্যবস্থিত, জাগ্রৎ কালে স্থির কিনা সুব্যবস্থিত। "তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ" স্বপ্ন কাল এবং জাগ্রৎকাল দুয়ের মধ্যে বিষয়-ঘটিত এইরূপ প্রভেদ।

"সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে" উভয় কালের সাক্ষীরূপা যে সম্বিৎ তাহা একই অভিন্ন। পঞ্চদশীর এই কথাটির প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় তবে তাহা এই যে, স্বপ্ন-কালের এবং জাগ্রৎকালের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যদি একই না হইত, তবে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদ্রাবস্থার কোনো স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহারো স্মরণে আবির্ভূত হইতে পারিত না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ" সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান অন্ধকার বোধ আবির্ভূত হয়—অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না এইরূপ স্মরণ হয়। স্মৃতি কিরূপ ? না "সাচাববুদ্ধবিষয়া" অববুদ্ধবিষয়া—জ্ঞাত-পূর্ব্ববিষয়া। জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় কথনো স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। কমলা নেবুর গাছ দেখিবার সময় দর্শকের জ্ঞানে তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিল বলিয়াই পরে যেমন তাহা তাহার স্মরণে আবির্ভূত হয়, তেমনি সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এই জ্ঞানটি সুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাগিতেছিল বলিয়াই পরে তাহার স্মরণ হয় যে নিদ্রাবস্থায় আমি কিছুই জানিতেছিলাম না। "অববুদ্ধং তৎ তদা ততঃ।" অতএব সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার সুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্চদশীর প্রদর্শিত এই প্রমাণটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে, সুষুপ্তি-কালে সম্বিৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত থাকে বলিয়া তাহা যে তখন নাই এরূপ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা সমস্ত মনোবৃত্তির সাক্ষী রূপা একমাত্র সম্বিৎ যদি সুষুপ্তির সময় বাস্তবিকই না থাকিত তাহা হইলে তাহা সুষুপ্তির পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়া আসিতে পারিত না। তাহা হইলে পূর্ব্ব দিনের

সম্বিৎ পরদিনে আসিতে না আসিতেই সুষুপ্তিরূপ দস্যুর হস্তে নিহত হইত। যখন তাহা নিহত হয় নাই, তখন তাহা অবশ্যই সুষুপ্তির আবরণের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ছিল ; যখন বর্ত্তমান ছিল, তখন অবশ্য সাক্ষি-রূপেই বর্ত্তমান ছিল—কেননা লবণের যেমন লবণত্ব—সম্বিতের তেমনি সাক্ষিত্বই আদি অন্ত এবং মধ্য। আমি যদি প্রথম দিন কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া তৃতীয় দিনে কাশীতে উপনীত হই তবে তাহা-তেই প্রমাণ হয় যে, আমি দ্বিতীয় দিন মাঝের পথে ছিলাম। তেমনি, একই অভিন্ন সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যখন কালিকের দিন হইতে আজি-কের দিনে উপনীত হইয়াছে, তখন সমস্ত মাঝের পথে তাহা বর্ত্তমান ছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না ;—বর্ত্তমান যখন ছিল—তখন সাক্ষীরূপেই বর্ত্তমান ছিল ; কেন না অসাক্ষী সম্বিৎও যা—অমিষ্ট মধুও তা, আর, সোণার পাথর বাটীও তা—একই। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "সবোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ" সেই যে সুষুপ্তি-কালীন অজ্ঞান-অন্ধকার-বোধ তাহা অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ বিষয় হইতেই ভিন্ন, তা বই বোধ বোধ-হইতে ভিন্ন নহে—সম্বিৎ সম্বিৎ-হইতে ভিন্ন নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ কালের সুব্যবস্থিত বিষয়-সকলের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ, স্বপ্ন-কালের অব্যবস্থিত বিষয় সকলের সাক্ষিরূপা সম্বিৎ, এবং সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞানান্ধকারের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ—তিন বিভিন্ন সম্বিৎ নহে কিন্তু একই অভিন্ন সম্বিৎ। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিৎ তদ্বৎ দিনান্তরে।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একই সম্বিৎ যেমন একদিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহা দিনান্তরেরও সাক্ষী। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে একা কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। ইহার পরেই বলিতেছেন "ইয়ং আত্মা" এই সম্বিৎই আত্মা। পঞ্চদশীর এই কথাটি Hamilton বলিতে বলিতে রহিয়া গিয়াছেন। Hamilton বলিতেছেন—

The next term to be considered is conscious subject. And first what is it to be conscious? ······This act is of the most elementary character; it is the codition of all knowledge······I know, I desire, feel. What is it that is common to all these? knowing & feeling & desiring are not the same, and may be distinguished. But they all agree in one fundamental condition. Can I know without knowing that I know? can I desire without knowing that I desire? can I feel without knowing that I feel? this is impossible. Now this knowing that I know or desire or feel, this common condition of self-knowledge, is precisely what is denominated consciousness. Hamiltion এইরূপ সম্বিৎকে জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সাধারণ ভিত্তিমূল জানিয়াও সাহস করিয়া এরূপ কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই যে, সম্বিৎই আত্মা। প্রত্যুত তিনি বলিয়াছেন যে—

Though consciousness be the condition of all internal phenomena, still it is itself only a phenomenon; and

therefore supposes a subject in which it inheres ;—that is supposes some thing that is conscious,—something that manifests itself as conscious। কিন্তু পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সেই যে something that is conscious, সেটা consciousness itself, সেটা সম্বিৎ স্বয়ং।

পঞ্চদশী Hamilton এর ন্যায় সম্বিৎকে আত্মার পরিবর্তনশীল অবভাস মাত্র, pheuomenon-মাত্র, বলেন নাই ঃ—পঞ্চদশী সম্বিৎকে অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা ॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, একাকী কেবল স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। স্বয়ংপ্রভা শব্দের অর্থ কি? তাহার অর্থ বলিতেছি শ্রবণ করুন। দীপালোক যেমন আলোক তো আছেই, তা ছাড়া তাহা আপনার আলোকে আপনি আলোকিত অথবা যাহা একই কথা—আপনার আপনি আলোকয়িতা; এইরূপ, যেমন তাহা আলোক, আলোকিত এবং আলোকয়িতা তিনই একাধারে; তেমনি, সম্বিৎ—জ্ঞান তো আছেই, তা ছাড়া তাহা আপনি আপনার জ্ঞাত—আপনি আপনার জ্ঞাতা;—কেননা সম্বিৎ আপনার অজ্ঞাত-সারে কিছুই করে না—সম্বিৎ সর্ব্বদাই আপনার জ্ঞানালোকে বিরাজমান; সম্বিৎ স্বয়ম্প্রভা। মুখে বলিতেছি আত্মা, মনে ভাবিতেছি জড়পিণ্ডের ন্যায় একটা অজ্ঞান-পদার্থ অথবা আকর্ষণ-শক্তির ন্যায় একটা অন্ধ শক্তি—এরূপ ইতস্তত-ভাব আমাদের দেশীয় পুরাতন দর্শনকারদিগের ত্রিসীমার মধ্যে ঘেঁসিতে পাইত না। সাজানো কথা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। ভাবিবার সময় তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের সব দিক্

সমীচীন-রূপে ভাবিতেন; আর, প্রকাশ করিয়া বলিবার সময় তাঁহারা তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্টাপষ্টি অসঙ্কোচে বলিতেন; লোকে কে কি ভাবিবে—কে কি বলিবে—তাহার কোনো তক্কা রাখিতেন না। যিনি নিরীশ্বরবাদী তিনি একেবারেই নির্ঘাত কলিয়া দিলেন 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ঈশ্বরের প্রমাণ নাই; Mill পর্য্যন্ত এরূপ তীব্র কথা বলিতে সাহস করেন নাই। যিনি অদ্বৈতবাদী তিনি একেবারেই সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া বলিলেন "সোহহং"—জর্ম্মান দর্শন-কারদিগের প্রপিতামহ Spinoza এরূপ কথা বলিতে সাহস করা দূরে থাকুক্—ওরূপ কথা সহসা কাহারো মুখে শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যাইত! আপনারা শুনিলে অবাক্ হইবেন যে, গৌতমের প্রণীত ন্যায়-শাস্ত্রের গোড়াতেই দেবতা-বন্দনা হ'চ্চে "ওঁ নমঃ প্রমাণায়" প্রমাণকে নমস্কার করি। একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-দিগের কিছুই অসাধ্য নাই, তাঁহারা হয় তো বলিবেন যে "প্রমাণায়" অর্থাৎ যাঁহার প্রকৃষ্টরূপে মান আছে তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা যাঁহাকে সকলের আগে বন্দনা করা হয় তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা গণেশায়। নমঃ প্রমাণায় কিনা নমো গণেশায়! সে কথা যা'ক্! Hamilton বলিয়াছেন Consciousness জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা সমস্তেরই সাধারণ ভিত্তিমূল বটে —কিন্তু;—ইত্যাদি; কিন্তু পাতঞ্জলের গ্রন্থ মধ্যে এই যে একটি সূত্র আছে

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্যো বিকল্পঃ"

ইহার মধ্যে বটেও নাই কিন্তুও নাই। উহার অর্থ এই;—শব্দ উচ্চারণের পিছনে পিছনে যে এক প্রকার অর্থশূন্য জ্ঞান উদ্বোধিত হয় তাহারই নাম বিকল্প। সে কিরূপ? টীকাকার ভোজরাজ বলিতেছেন "যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপং ইত্যত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতিবৎ শব্দজনিতে জ্ঞানে যোঽধ্যবসিতো ভেদস্তমিহা-বিদ্যমানমপি সমারোপ্য বর্ত্ততেঽধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব

পুরুষঃ।” না যেমন, ‘চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ-লক্ষণ’ এই কথাটিতে দেব-দত্তের কম্বলের ন্যায় পুরুষের মধ্যে এবং চৈতন্যের মধ্যে মিথ্যা একটা ভেদ আরোপিত হয়;—বাস্তবিক চৈতন্যই পুরুষ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ‘দেবদত্তের কম্বল’ বলিলে যেমন দেবদত্ত মনুষ্য এবং তাহার গায়ের কম্বল একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, এইরূপ বুঝায়, তেমনি “আত্মার চৈতন্য” এরূপ বলিলে বুঝায় যে, আত্মা যেন চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, চৈতন্যই আত্মা। পঞ্চদশী যাহাকে বলিতেছেন সম্বিৎ, যোগশাস্ত্রে তাহা প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ চেতনা শব্দের অর্থ টীকাতে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই :—

“বিষয়প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্‌চেতনা” বিষয়ের প্রতিকূলে অন্তঃকরণের অভিমুখে যাহার গতি, এমন যে চেতনা কিনা দৃক্‌শক্তি কিনা জ্ঞান-শক্তি বা ধীশক্তি, তাহাই প্রত্যক্ চেতনা। প্রত্যক্ শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ অন্তর্মুখী, ইংরাজি অনুবাদ subjective। ইউরোপীয় দর্শনের subjective এবং objective শব্দ-যুগলের অবিকল সংস্কৃত প্রতিশব্দ যদি আপনাদের কাহারো কখনো আবশ্যক হয়—তবে subjective-এর স্থলে প্রত্যক্ অথবা প্রতীচীন শব্দ এবং objective-এর স্থলে পরাক্ অথবা পরাচীন শব্দ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন—তাহাতে অভিপ্রেত অর্থের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। পঞ্চদশী এই প্রত্যক্ চেতনাকে—সম্বিৎকে—লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন “ইয়ং আত্মা” ইনিই আত্মা। প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিই আত্মা, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্যটি ইংরাজি ভাষায় অতীব সহজে এক কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে,—সে কথা এই যে, আত্মা is not a dead substance but a living intellegent power। যোগ-

শাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিও যা, আর, পঞ্চদশীর সম্বিৎও তাই, একই। পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥"

এই যে সম্বিৎরূপী—সাক্ষীরূপী—আত্মা, ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ যেহেতু ইনি পরম প্রেমাস্পদ। আত্মা যে আপনি আপনার প্রেমাস্পদ তাহার প্রমাণ কি? না "মা ন ভূবং হি ভূয়াসং ইতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে" "আমি না হই" ইহা কাহারো ইচ্ছা নহে "আমি হই" ইহা সকলেরই ইচ্ছা—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মা আপনি আপনার প্রেমাস্পদ। আত্মা শুধু যে আপনার প্রেমাস্পদ তাহা নহে—আত্মা আপনার পরম প্রেমাস্পদ। কিসে জানিলে? পঞ্চদশী বলিতেছেন "তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি অতস্তৎ পরমং" সে প্রেম আপনার জন্য অন্যেতে সঞ্চারিত হয়—অন্যের জন্য আপনাতে সঞ্চারিত হয় না—এই জন্য তাহা পরম শব্দের বাচ্য। পঞ্চদশীর এই কথাটির কিঞ্চিৎ টীকা আবশ্যক। আমাদের প্রতিজনের আপনার শরীরের প্রতি অথবা বিষয়-বিভবের প্রতি অথবা মান সম্ভ্রমের প্রতি যে, টান আছে তাহার আতিশয্য হইলেই তাহাকে আমরা বলি স্বার্থপরতা। কিন্তু এখানে সেরূপ গৌণ আত্মপ্রীতির কথা হইতেছে না, এখানে মুখ্য আত্মপ্রীতির কথা হইতেছে। আপনার সিন্দুকের টাকাকে অথবা আপনার উদরকে যিনি আত্ম-তুল্য দেখেন—সেই টাকাকে বা উদরকে ভালবাসাই তাঁহার আত্মপ্রীতি; সেরূপ আত্মপ্রীতির কথা এখানে হইতেছে না; সম্বিৎ-রূপী আত্মার যে আপনার প্রতি আপনার প্রেম তাহাই এখানে আত্মপ্রেম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। টাকা কড়ি লইয়াই, মানাভিমান লইয়াই, মনুষ্যে মনুষ্যে অমিল হয়; কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা লইয়া কাহারো সহিত

কাহারো অমিল হয় না। অমিল দূরে থাকুক্—বিশুদ্ধ চেতনার আপনার প্রতি আপনার ভালবাসার ভিতরে সমস্ত জগতের প্রতি ভাল বাসা সম্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ এই কথাটির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী তাহার পরেই বলিতেছেন "তেন পরমানন্দতাত্মনঃ" তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এ কথাটির তাৎপর্য্য আর একটু স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলা উচিত ছিল। যাহা পরম প্রেমাস্পদ তাহাই কি আনন্দ স্বরূপ? দেবদত্ত আমার পরম প্রেমাস্পদ হইলেও এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, দেবদত্ত বিষাদে ম্রিয়মান। মানিলাম যে. আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ কিন্তু তাহা হইতেই কিছু আর এটা আসিতেছে না যে, আত্মা পরম আনন্দ-স্বরূপ। এ স্থলটিতে পঞ্চদশীর হইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ ওকালতি করিতে হইল। তুমি যদি আমার পরম প্রেমাস্পদ হও, আর, তোমাকে যদি আমি নিকটে পাই তবে অবশ্যই আমার আনন্দ হইবে। আত্মা যেমন আপনাকে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে, তেমনি আপনি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমাস্পদ বন্ধুর নিকটতম সহবাসে যেরূপ পরম আনন্দ হয়—আত্মা কখনই সে আনন্দে বঞ্চিত হইতে পারে না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধং পরব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে॥" এইরূপ যুক্তি-দ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মা সৎ চিৎ এবং পরমানন্দ; আত্মা যে সৎ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; দেখানো হইয়াছে যে, "মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥" মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—এক কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ

উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। সম্বিৎ অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, আর অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া তাহা সৎশব্দের বাচ্য। দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত তিন অবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সাক্ষীরূপে নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া থাকে। সম্বিৎ যেমন সৎ তেমনি চিৎ। আর, কিয়ৎপূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎই আত্মা, আর সেই আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ অতএব পরম আনন্দস্বরূপ। আত্মা যেমন সৎ, তেমনি চিৎ, তেমনি পরম আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং উভয়ের ঐক্য বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চদশী অতঃপর যাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ ইহাও সত্য, আর, আপনি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ইহাও সত্য; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহা আপনার নিকটে অপ্রকাশ থাকিতে পারে; অপ্রকাশ থাকিলে আত্মা আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়াও নিকটবর্ত্তী নহে। কাজেই সে অবস্থায়—অপ্রকাশ অবস্থায়—আত্মার আনন্দ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মনে কর যে, আমার বাড়ির ভিত্তিমূলে রত্নের খনি রহিয়াছে কিন্তু আমার নিকট তাহা অপ্রকাশ। তাহা আমার নিকটে প্রকাশ পাইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না; কিন্তু এখন আমি সে আনন্দে বঞ্চিত। একদিকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে আত্মা কিছু না কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাই কেহই এরূপ ইচ্ছা করে না যে, আমি যেন না থাকি, প্রত্যুত সকলেই এইরূপ ইচ্ছা করে যে, আমি যেন থাকি। আর একদিকে দেখা যায় যে, আত্মা যদি মনুষ্যের নিকটে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইত তবে তাহার বিষয়-স্পৃহা থাকিত না। কোহিনুর হস্তে পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াসী হয়। পরম আনন্দ হস্তে পাইলে কে অপর আনন্দের প্রয়াসী হয়? মনুষ্যের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ প্রকাশ

পাইলে মনুষ্য তাহারই আনন্দে ভোর হইয়া থাকিত—বিষয়-স্পৃহা তাহার মনের চৌকাট ডিঙাইতে পারিত না। কিন্তু মনুষ্য দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে—আত্মা তাহার পরম প্রেমাস্পদ অথচ তাহার বিষয়-স্পৃহা ভরপুর। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, আত্মা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। পঞ্চদশী তাই বলিতেছেন

"অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা।
অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥

"অভানে" অর্থাৎ অপ্রকাশে "ন পরং প্রেম" পরম প্রেম হইতে পারে না; "ভানে" প্রকাশে "ন বিষয়স্পৃহা" বিষয়ের প্রতি স্পৃহা হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের দুইই আছে;—যাহা কেবল প্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—আপনার প্রতি পরম প্রেম আছে; আর, যাহা কেবল অপ্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট স্পৃহা আছে;

"অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥"

অতএব আত্মার পরমানন্দতা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। সে কিরূপ? পঞ্চদশী বলিতেছেন

"অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥"

নানা সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আমার পুত্র যখন বেদ-পাঠ করিতেছে, তখন সেই সমবেত পাঠধ্বনির সঙ্গে আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনিও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। এ অবস্থায় আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমি শুনিতেছি তাহাতে আর ভুল নাই কিন্তু কোন্ ধ্বনিটি আমার পুত্রের কণ্ঠ-নিঃসৃত তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবেই হইতেছে যে, আমার সেই পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকাশ

পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ না পাই-বার কারণ কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ভাণেঽপ্যভাণং ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥"

ভাণেঽপ্যভাণং অর্থাৎ প্রকাশেও অপ্রকাশ "ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে" প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্তই সম্ভবে। একেবারেই না থাকা স্বতন্ত্র, আর, প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ স্ফূর্ত্তি না পাওয়া স্বতন্ত্র। মনে কর সমান বলবান্ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠেলিয়া কেহ কাহা-কেও নড়াইতে পারিতেছে না। নড়াইতে পারাই বলের লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা কেহ বলিতে পারেন না যে, দুই জনের কেহই যখন কাহাকেও নড়াইতে পারিতেছে না, তখন উভয়ের কাহারো শরীরে একবিন্দুও বল নাই। প্রকৃত কথা এই যে, দুই জনেরই শরীরে প্রভূত বল আছে—কেবল প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। ইহার কিয়ৎপরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনং।"

বেদপাঠের দৃষ্টান্ত স্থলে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত একত্রে পঠনই প্রতিবন্ধের হেতু—এখানে অনাদি অবিদ্যাই বিভ্রান্তির একমাত্র কারণ। তাহার পরে পঞ্চদশী মায়া এবং অবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এইরূপ;—

এ পারে জীব, ওপারে ঈশ্বর, মাঝখানে ঐশী শক্তির প্রভাব;—সেই প্রভাব অথবা যাহা একই কথা, প্রকৃতি, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা-ধীন এই অর্থে তাহা মায়া শব্দের বাচ্য, আর তাহা জীবের অজ্ঞাত-সারে তাহাকে সংসারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায় এই অর্থে তাহা অবিদ্যা-

শব্দের বাচ্য। তাহার পরে পঞ্চদশী অবিদ্যার তিনটি অবান্তর-বিভাগ যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই ;—

(১) স্থূল শরীর—ইহা অস্থি মাংস মজ্জা প্রভৃতি ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত এবং ইহা জাগ্রৎকালে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; (২) সূক্ষ্ম শরীর—ইহা বিজ্ঞানময় কোষ (intellectual function), মানোময় কোষ (animal function), এবং প্রাণময় কোষ (vital function), এই তিনের সঙ্ঘাত; আর, ইহা স্বপ্নকালে স্থূল শরীর হইতে অবসৃত হইয়া স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়; (৩) কারণ শরীর—ইহার অপর নাম আনন্দময় কোষ এবং ইহা সুষুপ্তিকালে সমস্ত দুঃখ শোক হইতে অবসৃত হইয়া আরাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অবিদ্যার এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম অবান্তর-বিভাগাপ্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী বলিতেছেন

"যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥"

যেমন শর-গাছের বহিঃস্থিত পত্রাবরণের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ এক একটি স্তবক একে একে সরাইয়া অবশেষে তাহার গর্ভ হইতে নূতন কোমল পত্র উদ্ধৃত করা যায়, তেমনি ধীর ব্যক্তিরা স্থূল-সূক্ষ্ম-এবং-কারণ শরীর হইতে আত্মাকে উত্তরোত্তর-ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া পরব্রহ্ম হইয়া যা'ন। তাহার কিয়ৎ পরে পঞ্চদশী তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন

"জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীং।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তাং উচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা ॥"

তামসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া যে-ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ (material cause) এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা মায়া পরিগ্রহ করিয়া যিনি নিমিত্ত কারণ (efficient cause) তিনি তত্ত্বমসি বাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দের বাচ্য। ঐশীশক্তি বা মায়াকে পঞ্চদশী এইরূপ

দুই অবয়বে বিবিক্ত করিয়াছেন—প্রথম, নিমিত্ত কারণ—বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মায়া ; দ্বিতীয়, উপাদান কারণ—তামসী মায়া। একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব জগতে প্রকাশ করিতেছেন ; আর একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব সমস্তই একেবারে প্রকাশ করেন না—যথা-নিয়মে উত্তরোত্তর-ক্রমে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই প্রবর্ত্তিত নিয়ম। ঐশীশক্তিতে প্রকাশের স্ফূর্ত্তি এবং পূর্ণ-প্রকাশের প্রতিবন্ধক এই দুই অবয়বের প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রথমটিকে পঞ্চদশী বলিয়াছেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মায়া এবং দ্বিতীয়টিকে বলিয়াছেন তামসী মায়া। পঞ্চদশীর মতানুসারে, এইরূপ দ্বিমুখী মায়া-দ্বারা কিনা ঐশী শক্তি দ্বারা যিনি জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি তৎ শব্দের বাচ্য। এই গেল তত্ত্ব-মসি শব্দের তৎ। তাহার পরে আসিতেছে

"যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাং।
আদত্তে তৎপরং ব্রহ্ম ত্বংপদেন তদোচ্যতে॥"

"সেই পরব্রহ্ম যখন বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি ত্বং শব্দে অভিহিত হ'ন।" বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া অর্থাৎ রজোগুণ-প্রধানা মায়া—অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা যাহার মূল-গত ভাব হ'চ্চে রজোগুণ কিনা struggle for existence। এখানে পঞ্চদশী মায়াকে তিন অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন ; (১) ঐশী শক্তির প্রভাব—যাহার মূলগত ভাব প্রকাশ ; (২) ঐশীশক্তির নিয়ম—যাহা ঐশ্বরিক ভাবের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক ; (৩) জীবের অভ্যন্তরে ঐশী শক্তির বিচেষ্টা—যাহার স্থূল দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে ;—তাহা আর কিছু না—

Darwin যাহাকে বলেন struggle for existence। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীং
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

পরস্পর-বিরোধিনী এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, তমোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ এবং রজোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া জীব অবিদ্যার বশীভূত, এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া) এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। ইহার পরের শ্লোকে পঞ্চদশী আপনার চরম মন্তব্য কথাটি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; তাহা এই যে,

"সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

"সেই এই কালিদাস" এই বাক্য হইতে সেই এবং এই ছাড়িয়া দিয়া যেমন সেই-এই-বর্জ্জিত কেবলমাত্র কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যবর্ত্তী ঐশীশক্তির প্রভাব যাহা এ-পারে জীবের অবিদ্যারূপে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ও-পারে ঈশ্বরের মায়া রূপে প্রকটিত হয়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। এই গেল অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। এখন যোগশাস্ত্রের প্রণেতা পাতঞ্জল জীবেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখা যা'ক্।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-বিষয়ে দিব্য একটি সূত্র বিন্যস্ত আছে ; তাহা এই ;—

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজং"

ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ" এই কথা বলিলেই হইত, তাহা না বলিয়া "ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত" এরূপ ঘুরাইয়া বলিবার তাৎপর্য্য কি ? বিশেষ একটু তাৎপর্য্য আছে ;—তাহা এই যে, জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব পরাকাষ্ঠা বিকসিত রহিয়াছে। "জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে" ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে, জীব যদিচ সর্ব্বজ্ঞ নহে, তথাপি তাহার জ্ঞান সাধন-দ্বারা ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্বের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। জীবে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ রহিয়াছে কিন্তু সে বীজের সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়া জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে। ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরিপূর্ণ বিকাশ-প্রাপ্ত বলিয়া তিনিই কেবল সর্ব্বজ্ঞ। টীকাকার ভোজরাজ ঐ সূত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ;—

"দৃষ্টা হি অণুত্বমহত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মানাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ" অণুত্ব মহত্ত্ব প্রভৃতি (অর্থাৎ ছোটত্ব বড়ত্ব প্রভৃতি) যে কোনো ধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য সম্ভবে তাহারই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি কোথাও না কোথাও দেখা যায় ; কিরূপ ? না "যথা পরমাণৌ অণুত্বস্য আকাশে চ পরম মহত্ত্বস্য" যেমন পরমাণুতে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি এবং আকাশে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। "এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মাস্তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানা ক্বচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি—যত্র চৈতে নিরতিশয়াঃ স ঈশ্বরঃ।" এইরূপ জ্ঞানাদি চিত্তধর্ম্ম যাহা কোথাও বা অল্প পরিমাণে, কোথাও বা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা অবশ্য কোথাও না

কোথাও পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে—যাঁহাতে জ্ঞানাদি ধর্ম্ম পরাকাষ্ঠা পূর্ণতাপ্রাপ্ত তিনিই ঈশ্বর।" "ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত" ইহার অর্থ এখন বুঝা গেল; তাহা এই যে, ঈশ্বরেতে যে জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান—জীবেতে সেই জ্ঞান বীজভাবে অবস্থিতি করিতেছে। পাতঞ্জলের এই সিদ্ধান্তটির উপরে যদি পঞ্চদশীর প্রদর্শিত ভাগত্যাগ-লক্ষণা (কি না বিবেক-পদ্ধতি analysis) প্রয়োগ করা যায়; অর্থাৎ জীব-জ্ঞানের বীজ ভাব এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ-ভাব, এ দুই কথার উল্লেখ না করিয়া যদি "উভয়েরই জ্ঞান আছে" এই বৃত্তান্তটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা যায়, তবে তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, জ্ঞানের সত্তা-মাত্র জীবেশ্বরের ঐক্য-স্থান। পঞ্চদশী মূল সত্যের অন্বেষণে বাহির হইয়া সম্বিৎ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার খুবই বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে; কেননা জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই সত্যান্বেষণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। কিন্তু তিনি কেবল-মাত্র বিবেক-পদ্ধতি (ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে process of analysisকেবল-মাত্র সেই বিবেক-পদ্ধতি) অবলম্বন করিয়া চলাতে সম্বিতের নির্গুণ একত্বে (analytic unityতে) আটক পড়িয়া আরম্ভ-স্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কাণ্টের প্রদর্শিত analytic judgement এবং synthetic judgement দুয়ের প্রভেদ যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, বিবেক পদ্ধতি অনুসারে, analysis পদ্ধতি অনুসারে, জ্ঞানে যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে তাহাকেই কেবল মার্জ্জিত করা যাইতে পারে কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে না, জ্ঞানের আয়-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। পঞ্চদশী বিবেক-পদ্ধতির জলাশয়ে সম্বিৎকে স্নান করাইয়া তাহার গাত্র-হইতে ঐশী শক্তির প্রভাব

মার্জ্জন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন;—এটা তিনি দেখেন নাই যে, সম্বিতের গাত্র হইতে অবিদ্যা মার্জ্জন করা যেমন আবশ্যক, বিদ্যা দ্বারা সম্বিতের পুষ্টি সাধন করাও তেমনি আবশ্যক। সম্বিৎকে যেমন স্নান করানো আবশ্যক, তেমনি তাহাকে আহার দান করাও আবশ্যক। মনকে এরূপ প্রবোধ দিলে চলিবে না যে, অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলার নামই বিদ্যা উপার্জ্জন করা; কেননা ইহা সকলেরই জানা কথা যে, মরীচিকায় জল-ভ্রম ঘুচিয়া গেলেও—অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও—মরীচিকা-সম্বন্ধে বিদ্যা-উপার্জ্জনের অনেক অবশিষ্ট থাকে। মরীচিকা দেখিলেই পথিকের জল-ভ্রম হয়; কিন্তু সে যখন দৃশ্যমান জলাশয়ের নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখে যে, কোথাও জলের নাম-গন্ধও নাই, তখন তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়—অবিদ্যা ঘুচিয়া যায়; অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও—মরীচিকা-বিষয়ে তাহার বিদ্যার কিছু মাত্র আয়-বৃদ্ধি হয় না। সে কেবল এইটুকু মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মরীচিকা জল নহে; তা বই—মরীচিকা যে, পদার্থটা কি, তাহা তাহার স্বপ্নের অগোচর। দৃশ্যমান জগৎ আমাদের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে তাহা তাহার স্বরূপগত ভাব নহে ইহা জানিতে পারা'র নামই অবিদ্যা ঘুচিয়া যাওয়া—ভ্রম ঘুচিয়া যাওয়া। আর সেই দৃশ্যমান জগতের অভ্যন্তরে ঐশীশক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে তাহা জানিতে পারা'র নামই বিদ্যা। তাই আমরা বলি যে, সম্বিৎ হইতে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত বিদ্যা দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্যক। Maxmuller কৃত kant দর্শনের অনুবাদের উপক্রমণিকার এক-স্থানে এইরূপ লিখিত আছে;—

This is from one point of view the great truth of idealism, that the source of all direct knowledge is to be

found in consciousness ; but from another latet anguis in herba (শেষের ভাগটা latin উহার অর্থ—snake lies hidden in the grass) অর্থাৎ বাহিরে দেখিতে ভাল কিন্তু ভিতরে মার প্যাঁচ রহিয়াছে ;—সে মার প্যাঁচ কিরূপ তাহা তাহার পরেই প্রশ্নচ্ছলে ইঙ্গিত করা হইতেছে :—

Are our thoughts really so much in our power ? or are we not rather in relation to them, conditioned and overruled by countless influences which have their source in the thought of our contemporaries and still more in that of antiquity ? পাতঞ্জল বলিতেছেন and above all in that of ঈশ্বর ? তিনি বলিতেছেন যে,

"স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সম্বিৎ হইতে অবিদ্যা ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে ; পাতঞ্জল বলিতেছেন যে, তদ্ব্যতীত সম্বিৎকে বিদ্যা-দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে হইবে ; এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। টীকাকার ভোজরাজ "ঈশ্বর প্রণিধান" কথাটির তাৎপর্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ;—ঈশ্বর-প্রণিধান কি ? না "তত্র ভক্তিবিশেষঃ" ঈশ্বরেতে বিশিষ্টরূপ ভক্তি। "বিশিষ্টমুপাসনং" বিশিষ্টরূপ উপাসনা "সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং" তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। "বিষয়-সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তি" বিষয়-সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর প্রতি নিবেদন করিয়া দেওয়া" "তৎপ্রণিধানং" ইহারই নাম প্রণিধান। পঞ্চদশী ঐশী শক্তির প্রভাবকে মিথ্যা মায়া-বোধে সম্বিৎ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে বলেন ; পাতঞ্জল তাহা বলেন না ;—পাতঞ্জল

পরম গুরু পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তির প্রভাবে পরিগঠিত হইয়া আত্ম-শক্তি উপার্জ্জন করিতে বলেন—প্রকৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব উপার্জ্জন করিতে বলেন। সাংখ্যমত এবং অদ্বৈত মতের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই স্থানটিতে। অদ্বৈত-বাদী প্রকৃতি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভ করিবার পরামর্শ দে'ন। সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতির অধীনতা হইতে যদি মুক্তি পাইতে ইচ্ছা কর তবে প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞানে আয়ত্ত কর। বাহিরের দুর্দান্ত প্রকৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর এত পোষ মানিল কিসে? ঊনবিংশ শতাব্দী সাংখ্যের ঐ বচনটি শিরোধার্য্য করাতে! ঊনবিংশ শতাব্দী যদি সেশ্বর-সাংখ্য পাতঞ্জলের বচন শিরোধার্য্য করিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিত, তবে অন্তরের প্রকৃতিও ঐরূপই তাহার পোষ মানিত। সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল বলেন যে, ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু; তিনি আবহমান কাল মনুষ্যমণ্ডলীকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাহারই গুণে মনুষ্য জ্ঞানী হইয়াছে; নহিলে, শুধু কেবল সম্বিৎ মাজাঘসা করিয়া কেহই বিদ্যা উপার্জ্জনেও সমর্থ হয় না—প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভেও সমর্থ হয় না। পঞ্চদশীর গ্রন্থকারকে যদি তাঁহার দশ বৎসর বয়সে হিংস্রজন্তুরহিত, নানা সুখাদ্য ফল-বৃক্ষ শোভিত, একটি জনশূন্য উপ-দ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ এখনো যাহা তখনও তাহাই থাকিত কিন্তু তাহা হইলে তিনি পঞ্চদশী প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ সম্বিৎ-মাত্রই থাকিয়া যাইত—জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান মাত্রই থাকিয়া যাইত তথা হইতে তিনি একপদও জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। অতএব সম্বিৎকে যেমন মাজিয়া ঘসিয়া অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত করা আবশ্যক—তেমনি তাহাকে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত জনসমাজের সাধুসঙ্গের

প্রভাব দ্বারা, ঈশ্বরানুগৃহীত পুরাতন আচার্য্যদিগের উপদেশ দ্বারা এবং ঈশ্বরের উপাসনা-লব্ধ প্রসাদ সম্বল দ্বারা পরিপুষ্ট করা আবশ্যক। জ্ঞানের পরিশোধন যেমন আবশ্যক—পরিবর্দ্ধনও তেমনি আবশ্যক। শাস্ত্রের মতামত সংক্ষেপে বলিলাম; এখন তৎ তৎ বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝি তাহা দ্রুতগতি বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি। কেন না, আমার কাণের কাছে আমার সম্বিৎ ক্রমাগত ফুসলাইতেছে

"গতা বহুতরা ভ্রাতঃ স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।"

জীবেশ্বরের মধ্যে পাতঞ্জলের প্রদর্শিত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হইতে যাত্রারম্ভ করাই আমি শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি। গুরু যখন শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন, তখন তিনি দেয়ালকে জ্ঞানোপদেশ করেন না—আপনারই মতন একজন জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন। মনে কর যেন রসায়ণ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শিষ্য গুরুর নিকটে গমন করিলেন। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা গুরুও যেমন জানেন শিষ্যও তেমনি জানেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই জানেন যে, জল তরল পদার্থ। এই গোড়ার বিষয়টিতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই জ্ঞানের ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু এই গোড়ার ঐক্য স্বতন্ত্র, আর, শেষের ঐক্য স্বতন্ত্র। গোড়ার ঐক্য শিষ্যের যাত্রারম্ভ স্থান—শেষের ঐক্য শিষ্যের গম্য-স্থান। জলের মূল উপাদান সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব গুরু যেরূপ জানিতেছেন, শিষ্য যখন তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সেইরূপ জানিবেন, তখন গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে ইতিপূর্ব্বোক্ত গোড়ার ঐক্য ব্যতীত নূতনতর আর এক প্রকার ঐক্য আবির্ভূত হইবে। ইহাকেই আমি বলিতেছি শেষের ঐক্য। জল তরল পদার্থ এ বিষয়ে গুরুশিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্ব-হইতেই আছে; কিন্তু জলের মূল উপাদান অম্লজন এবং উদজন বায়ু; সেই দুই বায়ু উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে তাড়িত সঞ্চার করিলে

জল উৎপন্ন হয়; ইত্যাদি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিষয়ে গুরু-শিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্বে ছিল না—শিক্ষার পরিচালনা-দ্বারা তাহা নূতন আবির্ভূত হইল। এই শেষের ঐক্যই সাধনের বিষয়। গোড়ার ঐক্য সাধনের পূর্ব্ব হইতেই আছে। গোড়ার ঐক্য হইতে সাধক যাত্রারম্ভ করেন, এবং সাধন-দ্বারা শেষের ঐক্যে উপনীত হ'ন। যদি গুরুকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জ্ঞান ছাড়িয়া দেও, আর, শিষ্যকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জানিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দেও; আর, সেইরূপ রফার প্রস্তাবে যদি উভয়েই সম্মত হ'ন; তবে গোড়ার ঐক্য যাহা উভয়ের মধ্যে গোড়া হইতেই আছে, তাহাই থাকিয়া যায়—শেষের ঐক্য অনেক হাত জলের নিচে পড়িয়া যায়। গোড়া'র ঐক্যের নিজের বেশী কোনো মূল্য নাই। গোড়ার ঐক্যস্থানটির তখনই সার্থকতা হয় যখন শিষ্যের জ্ঞান সেইখান-হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া গুরুর উন্নত জ্ঞানের সহিত উত্তরোত্তর ক্রমশই ঘনিষ্ট ঐক্য-সূত্রে নিবদ্ধ হইতে থাকে। গুরু যদি একজন সামান্ত পাঠশালার গুরু মহাশয় হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো পাঁচ বৎসরের মধ্যেই গুরুর সমস্ত বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে গুরু যদি একজন দেশবিখ্যাত মহা-পণ্ডিত হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলেও তাঁহার বিদ্যার তল আঁকড়িয়া পা'ন না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুরু যেখানে অসীম মহান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, শিষ্য সেখানে কোনো নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই গুরুর জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার সহিত সমান হইতে পারিবেন না। মনুষ্য-মণ্ডলী ৩০।৪০ হাজার বৎসর ধরিয়া এই যে রাশি রাশি বিদ্যাধন নগর পল্লীর পুস্তকালয়ে স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে—তাহা সর্ব্বজ্ঞত্ব-ভাণ্ডারের এক কোণের

একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও যোগ্য নহে। গোড়া'র ঐক্য সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে; প্রস্তর পাষাণ এবং উদ্ভিদের মধ্যে আছে; উদ্ভিদ্ এবং জীবের মধ্যে আছে; জীবজন্তু এবং মনুষ্যের মধ্যে আছে; মনুষ্য এবং দেবতাদিগের মধ্যে আছে; দেব মনুষ্য পশু পক্ষী তরুলতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর—সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না,—কেননা সমস্ত জগৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু মনুষ্য অনন্ত কাল জ্ঞান এবং কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ না হইলে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের শেষের ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে না। সম্বিৎরূপী জ্ঞান-জ্যোতি জীবেশ্বরের এবং সমস্ত জ্ঞানবান্ জীবের গোড়ার ঐক্য-স্থান ইহা আমি পঞ্চদশীর গ্রন্থকারের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমি এই আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না যে, সেই গোড়ার ঐক্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ঈশ্বরের মহান্ গম্ভীর জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার সহিত আমাদের জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার ঐক্য ক্রমশই ঘনীভূত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সহযাত্রীদিগের সহিত ঐক্য ঘনীভূত করিতে হইবে। আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী, তবে তাহার উত্তরে আমি এই বলিব যে, প্রথমতঃ জীবেশ্বরের মধ্যে গোড়ার ঐক্য সর্ব্বাবস্থাতেই অটল রহিয়াছে এবং অটল থাকিবে—এ বিষয়ে আমি অদ্বৈতবাদী। দ্বিতীয়তঃ জীবেশ্বরের মধ্যে শেষের ঐক্য কস্মিন্ কালেও ছিল না—এখনও নাই—এবং ভবিষ্যতেও সংঘটনীয় নহে; কেন না কোনো জীবই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ছিল না, হয় নাই, হইবে না। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতবাদী। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক জ্ঞানবান্ জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দের বীজ যাহা নিহিত আছে, তাহাই জীবেশ্বরের

গোড়া'র ঐক্যস্থান;—ঈশ্বরোপাসনারূপ ক্ষেত্রকর্ষণে এবং ঈশ্বরের প্রসাদ-রূপ বারি-বর্ষণে সেই বীজ উত্তরোত্তর ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে;—যতই বিকাশ পায়, সাধক ততই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য—জ্ঞানে উপলব্ধি করে—প্রেমে উপভোগ করে, এবং যত্নে আত্মসাৎ করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হয়। এইরূপে গোড়ার ঐক্য হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সাধক ঈশ্বরের সহিত গাঢ়-হইতে গাঢ়তর ঐক্যবন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়—উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে সমুত্থান করে—গভীর হইতে গভীরতর অন্তরে নিমগ্ন হয়। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ইহার উপরে যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, জীবেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিম্বপ্রতি-বিম্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌কৃত না হইলে কে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর-ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে, এবং যত্নে উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইবে? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড়-দ্বারা একমেটে করিলেন, এবং জীব-চৈতন্য-দ্বারা দোমেটে করিলেন। জীব-ব্যতিরেকে অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি—তাহা থাকা না থাকা দুইই অবিকল সমান। অতএব অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বাদ-বিতণ্ডা বাদে আমার মতের সারাংশ কি যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহা সংক্ষেপে এইঃ—

নিত্য সত্য পরমাত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।
জ্ঞানে দৃশ্য, প্রেমে ভোগ্য, যত্নে লভনীয়॥
তাঁহারে পূজিয়া, জীব, হৃদে করি ধ্যান,
সাধিয়া তাঁহার কার্য্য, লভয়ে কল্যাণ॥

—— ——

অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় সমালোচনা।

আমার পূর্ব্বকৃত অদ্বৈত মতের সমালোচনা পাঠ করিয়া একজন শ্রদ্ধেয় প্রাচীন দর্শনবিশারদ পণ্ডিত তৎসম্বন্ধে আমাকে তাঁহার মনের কথা অতীব সরল ভাবে খুলিয়া বলিয়াছেন—সে কথা এই :—

"অদ্বৈতবাদিরা ব্রহ্ম হইতে চাহেন, এরূপ যাহারা বুঝে, তাহারা অদ্বৈতবাদের মর্ম্মজ্ঞ নহে—বিচার-মল্ল মাত্র। অদ্বৈতবাদীর মনের ভিতরে যে কথা থাকে তাহার একটি কথা এই

'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।

সামুদ্রোহি তরঙ্গো ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥'

ভেদ তিরোহিত হইলেও আমি তোমারই পরন্তু আমার তুমি নহ; সমুদ্রেরই তরঙ্গ - সমুদ্র তরঙ্গের নহে।"

এই উদ্ধৃত শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে তরঙ্গোপম জীবাত্মা সমুদ্রোপম পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইলেও 'সমুদ্র ব্যাপক এবং তরঙ্গ ব্যাপ্য—পরমাত্মা পূর্ণ এবং জীবাত্মা অপূর্ণ' এই যে দ্বৈতভাব, ইহা অপরিহার্য্য। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, অদ্বৈতবাদের ভিতরের কথা ব্যক্ত করিলেই তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে। একদিকে প্রাচীন অদ্বৈতবাদী এইরূপ সুস্পষ্ট বচনে আমার অভিপ্রেত দ্বৈতাদ্বৈত মতের পোষকতা করিয়াছেন; আর এক দিকে একজন নব্য অদ্বৈতবাদী * আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অজ্ঞাতসারে আমারই ঐ মতের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন

"দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহাকে পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদীরা তাহাকেই প্রকৃত আত্মলাভ বলিয়া থাকেন।"

---

* শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন এম এ বি এল্।

নব্য প্রতিবাদী দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না—আমি কিন্তু অদ্বৈত মতের প্রতিপাদক প্রধান একটি গ্রন্থে দেখিয়াছি যে, সাধকের জ্ঞান অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে

'স্বয়ং নশ্যেৎ জলে কতকরেণুবৎ'

আপনিও বিনষ্ট হয়—কি প্রকারে? না যেমন কতক-রেণু (অর্থাৎ নির্ম্মলী) জলের মলা বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনষ্ট হয়।

অদ্বৈতবাদীর এই 'বিনষ্ট হওয়া' অথবা 'বিলীন হওয়া' কথাটি প্রতিবাদীর মনঃপূত না হওয়াতে তিনি বিলীন হওয়াকে বিলীন হওয়া না বলিয়া আত্মলাভ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। প্রতিবাদীর মন বলিতেছে যে, বিলীন হইবার বাসনা অদ্বৈতবাদের একটি ক্ষতস্থান, তাই তিনি আত্মলাভ-শব্দের পটি দিয়া সেই ক্ষতস্থানটি আবরণ করিবার জন্য সমুৎসুক। প্রতিবাদী এক কারণে বিলীন হওয়াকে বিলীন হওয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, আমি আর এক কারণে বিলীন হওয়াকে আত্মলাভ বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। আমার পক্ষের কারণ এই যে, গোড়া হইতে আমার মনে এইরূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, বিলীন হওয়ার অর্থ আপনাকে লাভ করা নহে—বিলীন হওয়ার অর্থ আপনি লয় প্রাপ্ত হওয়া। প্রতিবাদী বলিতেছেন যে বিলীন হওয়ার অর্থ আত্ম-লাভ। তবে তাই সই! কিন্তু আমি আত্মলাভের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলি নাই;—বাদী যাহা বলে নাই, প্রতিবাদী কোমর বাঁধিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, ইহারই নাম বাতাসের সহিত যুদ্ধ করা। আমি আত্মলাভের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, কোনো নব্য বৈদান্তিক যদি সভাসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, ব্রহ্মের সহবাসে নবজীবন পাইয়া আত্মলাভ করাই সাধকের মুখ্য সংকল্প, তবে আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রীতিগদ্‌গদ চিত্তে তাঁহার সহিত আনন্দে হস্তা-

লোড়ন করিব—বলিব 'কে বলিল তুমি আমার প্রতিপক্ষ—তুমি আমার পরম আত্মীয়।'

আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনার উপসংহার ভাগে আমি আমার স্বমতের তিনটি বিভিন্ন অবয়ব ভাগ ভাগ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার প্রথম দুইটি (অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ) আমার মতের অসম্পূর্ণ অবয়ব, তৃতীয়টি (দ্বৈতাদ্বৈতবাদ) আমার মতের পূর্ণাবয়ব। অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদই আমার সমগ্র মত; প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী। তা ছাড়া, অদ্বৈত-বাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি অদ্বৈতবাদী; দ্বৈতবাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত সেই অংশে আমি দ্বৈতবাদী। যে অদ্বৈতবাদ এবং যে দ্বৈতবাদ - দ্বৈতাদ্বৈত-হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা যোদ্ধার ছিন্ন-হস্তের ন্যায় নির্জীব শুষ্ক এবং অকর্ম্মণ্য। কেহ বলিতে পারেন যে, 'তোমার অভিপ্রেত মত দেখিতেছি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—তাহা না বলিয়া তুমি বলিতেছ 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ,' ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছু না—আমার বিবেচনায়, বিশিষ্টাদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে এ কথা সাধারণ পাঠকের অনেকে হয়তো না জানিতে পারেন এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিপদে পাঠককে ঐ কথাটি স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতের পরিবর্ত্তে দ্বৈতাদ্বৈত শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। তাহাতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, যেহেতু আমি আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনার পরিশিষ্ট ভাগে দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের তাৎপর্য্য সবিশেষ বিবৃত করিয়া বলিয়াছি; * এই-রূপ বলিয়াছি যে, একটা কাচের পাত্রে তেল আর জল একত্রে স্থাপন করিলে দুয়ের মধ্যস্থলে একটা চক্রাকৃতি রেখা সকলেরই প্রত্যক্ষ-

* পরিশিষ্ট ভাগটি বর্ত্তমান সংস্করণে অনাবশ্যক বোধে প্রকাশিত হয় নাই।

গোচর হয়। সে রেখাটিকে জলরেখা বলিব, কিম্বা তৈলরেখা বলিব? তেলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা তৈলরেখা; জলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা জলরেখা। চক্রাকৃতি রেখাটি যেমন তেল আর জলের মধ্যবর্ত্তী, কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি সেইরূপ কার্য্য এবং কারণের মধ্যবর্ত্তী। কারণের দিক্‌দিয়া দেখিলে তাহা কারণ, কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা কার্য্য। এই জন্য উৎপাদিকা শক্তি কারণের সহিত এক হিসাবে অভিন্ন, আর এক হিসাবে বিভিন্ন। তাহা অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন। প্রাচীন দর্শনকার দেখিলেন যে, 'অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন' এ কথাটা মুখে বলিবার সময় স্ববিরোধী শুনায় বটে, অথচ উহার যাথার্থ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন'ও না, পারিবেন'ও না; ইহা দেখিয়া তিনি শক্তির নাম দিলেন 'অব্যপদেশ্য'। 'অব্যপদেশ্য' কিনা যাহা আপনার মনে আপনি বুঝা যায় কিন্তু অন্যকে উপদেশ করা যায় না—ভাবিয়া বুঝা যায় কিন্তু বলিয়া বুঝানো যায় না। অতএব শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। উভয়ের মধ্যে যে হিসাবে ভেদ নাই, সে হিসাবে পরমাত্মাতে কোনো জাতীয় ভেদই নাই—স্বজাতীয় ভেদ নাই—বিজাতীয় ভেদ নাই—স্বগত ভেদ নাই; যে হিসাবে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে, সে হিসাবে পরমাত্মাতে সকল প্রকার ভেদই আছে; তাহার সাক্ষী—জড়জগতের সহিত ঈশ্বরের বিজাতীয় ভেদ; চিৎজগতের সহিত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ; আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ সকলের সহিত তাঁহার স্বগত ভেদ।

প্রতিবাদী যখন বিলীন হওয়াকে আত্মলাভ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তখন তিনি পঞ্চদশীর নির্গুণ অদ্বৈতবাদকে হেগেলের মতানুযায়ী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি পঞ্চদশীর

"পরমাত্মাদ্বয়ানন্দঃ পূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্‌ভূত্বা প্রাবিশৎ জীবরূপতঃ ॥"

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার এইরূপ অর্থ করিতেছেন যে, 'অদ্বয়ানন্দ পরমাত্মা স্বমায়া দ্বারা পূর্ণ হইয়া স্বয়ংই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন।' এ কথাটি কোন্ দেশের কোন্ শাস্ত্রের কথা তাহা জানি না কিন্তু ঐ শ্লোকের টীকাতে এইরূপ লিখিত আছে যে,

'পূর্ব্বং, সৃষ্টেঃ প্রাক্ * * * * পরিপূর্ণঃ পরাত্মা স্বমায়য়া, * * * স্বনিষ্ঠয়া মায়াশক্ত্যা, স্বয়মেব জগদ্ ভূত্বা, স্বয়মেব জগদাকারতাং প্রাপ্য, জীবরূপতঃ প্রাবিশৎ।'

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরিপূর্ণ পরমাত্মা আপনার মায়া-শক্তি দ্বারা জগদাকারতা প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চদশী যেখানে বলিতেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা মায়াদ্বারা জগদাকারতা প্রাপ্ত হইলেন, প্রতিবাদী সেখানে বলিতেছেন 'পরমাত্মা মায়া-দ্বারা পূর্ণ হইয়া জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন।' পঞ্চদশীর শ্লোকের এইরূপ অর্থান্তর ঘটাইবার তাৎপর্য্য কি আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর তিনি পঞ্চদশীর ঐ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এক ছত্র শ্লোক যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সহিত হেগেলের Thesis (স্থাপন), Antithesis (প্রতিযোগ), এবং Synthesis (সমন্বয়) এই তিন পক্ষের কি যে প্রসক্তি তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন, 'অদ্বয়ানন্দরূপ পরমাত্মা, এটা thesis; স্বমায়া দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ংই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন, এটা Antithesis। সেই জীব ভেদ-দৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বহুজন্ম ভজনা করে; এবং পরিশেষে বহুজন্মসঞ্চিত সাধনপরিপাকবলে তাহার আত্মবিচারে প্রবৃত্তি হয়; ক্রমে আত্মবিচার দ্বারা মায়াকৃত ভেদদৃষ্টি নিরুদ্ধ হইলে অভেদ-দৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়, এটা Synthesis।' (!)। প্রকৃত কথা এই; —

অদ্বৈতবাদীর মতে দার্শনিক বিচারপদ্ধতির দুইটি পক্ষ—পূর্ব্ব পক্ষ এবং সিদ্ধান্ত পক্ষ। হেগেলের মতে দার্শনিক বিচার-পদ্ধতির তিনটি পক্ষ—স্থাপন পক্ষ, প্রতিযোগ পক্ষ, এবং সমন্বয় পক্ষ। অদ্বৈতবাদী বিবেক দ্বারা পূর্ব্ব পক্ষের সদসদাত্মক (অর্থাৎ সত্য মিথ্যা জড়িত) বচন হইতে তাহার অসদংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদংশ গ্রহণ করেন এবং তাহাই সিদ্ধান্তপক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। হেগেল স্থাপন-পক্ষ এবং প্রতিযোগ পক্ষ উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করিয়া উভয়ের অন্যোন্যাশ্রয়তা (অর্থাৎ পরস্পরাধীনতা) প্রতিপাদন করেন, এবং উভয়াত্মক তৃতীয় সত্য সমন্বয়-পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্বৈত-বাদীর অদ্বৈত—সমস্ত দ্বৈত ছাঁটিয়া ফেলিয়া অদ্বৈত; হেগেলের অদ্বৈত—সমস্ত দ্বৈত আত্মসাৎ করিয়া অদ্বৈত। অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত নির্গুণ অদ্বৈত—নির্বিশেষ অদ্বৈত—নিছক অদ্বৈত। হেগেলের অদ্বৈত সগুণ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত (অর্থাৎ দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈত)। অতএব ইহা স্থির যে, অদ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন হেগেলের চরম উদ্দেশ্য নহে—হেগেলের চরম উদ্দেশ্য দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়। প্রতিবাদীকে একদিকে যেমন আমরা দোষ দিই আর একদিকে তেমনি আমরা সাধুবাদ দিই। দোষ দিই এই জন্য যে, তিনি অদ্বৈতবাদের স্কন্ধে হেগেলের দ্বৈতাদ্বৈত মত চাপাইতে (নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গাত্রে হ্যাট্ কোটের বোঝা চাপাইতে) চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাকে সাধুবাদ দিই এই জন্য যে, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত মতের পটি দিয়া অদ্বৈতবাদের ক্ষতস্থান আবরণ করিবার জন্য তৎপর হওয়াতে আপনার দয়ার্দ্রচিত্তের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হেগেলীয় দর্শনের লোহার কড়াই ভাজা চিবানো হেগেলকেই পোষায়—আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পাঠকবর্গের ভোজনার্থে সেই রাক্ষসের খোরাক পরিবেষণ করিয়া আমি তাঁহাদের আর অধিক

অপ্রীতি-ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। নিতান্ত যেখানে উল্লেখ না করিলেই নয় সেইখানে কাণ্ট্ এবং হেগেলের কথা একটু আধটু উল্লেখ করিব। প্রথমে অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী আত্মজ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতি, সাধারণ পাঠকের বোধোপযোগী করিয়া, যত সহজে পারি, প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মনে কর আমি চাসা ছিলাম, রাজা হইলাম। আমার বুদ্ধিকৃত যোগ-প্রণালী দ্বারা আমিত্বের সঙ্গে রাজত্বের ভাব সংযোজিত হইয়া 'আমি রাজা' এইরূপ জ্ঞান আমার অন্তঃকরণে উদ্বোধিত হইল। এখন বক্তব্য এই যে, এইরূপ রাজাভিমানী অহংজ্ঞান আত্মজ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে। আমিত্ব × রাজত্ব এই যে গুণীকরণ বা গুণযোজনা, ইহা বুদ্ধি দ্বারা কৃত হইয়াছে—সুতরাং ইহা বুদ্ধির ফলস্বরূপ। কিন্তু আত্মা বুদ্ধির মূল স্বরূপ। আমিত্ব × রাজত্ব এইরূপ যুক্তি (কিনা যোজনা-ক্রিয়ার ফল) অন্তঃকরণে ফলিত হইলে তাহার নাম আমরা দিই 'অহংকার বা অহংকৃতি।' 'অহঙ্কৃতি' অর্থাৎ করিয়া তোলা অহং—যেমন রাজারূপে গড়িয়া তোলা অহং। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন—"আমিত্ব × রাজত্ব" যেন অহঙ্কার হইল—'আমিত্ব × চাসাত্ব" এটাও কি অহঙ্কার ?" এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, চাসা বলে 'আমি চাস করি খাই—কারো কোনো তক্কা রাখি না', চোর বলে 'আমি কেমন প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া চুরি করিয়াছি', মূর্খ বলে 'বিদ্যা শেখা বৃথা পণ্ডশ্রম, আমি সে দিকে যাই না—আমি অর্থের চেষ্টায় ফিরি'। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ব-অভিমান অথবা অহংকার কেবল যে বড়লোকের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে-সকল শ্রেণীর লোকের অন্তঃকরণেই তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজত্ব করে। অতএব এটা স্থির যে,

আমিত্ব × রাজত্ব এইরূপ গুণ যোজনা বা গুণীকরণ = অহঙ্কার ;

আর, তাহার ফল="আমি রাজা" এইরূপ জ্ঞান=অহংজ্ঞান বা অহং-প্রত্যয়।

তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধিকৃত গুণ-যোজনার সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান অন্তঃকরণে ফলিত হয়। যেমন কাগজের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের গুণী-করণ ব্যতিরেকে কাগজই হয় না—তেমনি আত্মতত্ত্বের সহিত অপর কোনো একটি তত্ত্বের (যেমন রাজত্বের বা চাসাত্বের) যোগ ব্যতিরেকে অহংজ্ঞান হইতে পারে না। এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অহংজ্ঞান যৌগিক জ্ঞান যেহেতু তাহা বুদ্ধিকৃত গুণ-যোজনা হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈতবাদীরা এইরূপ যৌগিক অহংজ্ঞানকে আভাস-চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধি-কৃত যোজনা কার্য্যের (বা অধ্যারোপের) ফল-স্বরূপ অহংজ্ঞান বুদ্ধির মূলস্থিত অকৃত্রিম * আত্মজ্ঞানের আভাস-মাত্র—অন্তকরণগত প্রতি-বিম্ব-মাত্র—তাহা প্রকৃত আত্মজ্ঞান নহে। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃত আত্মজ্ঞান যৌগিক (synthetic) নহে, তাহা বৈবেচিক (analytic) অর্থাৎ বিবেক-দ্বারা উৎপাদনীয়। যৌগিক অহংজ্ঞান হইতে রাজত্ব চাসাত্ব পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব প্রভৃতি আহঙ্কারিক ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলাই অদ্বৈতবাদের বিবেক-পদ্ধতি। এই বিবেক-পদ্ধতির সোপান অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতবাদী বুদ্ধির এ-পারস্থিত আভাস-চৈতন্য হইতে বুদ্ধির ও-পারস্থিত কূটস্থ চৈতন্যে উপনীত হ'ন—বুদ্ধির ফলস্বরূপ অহং-প্রত্যয় হইতে বুদ্ধির মূলস্থিত আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হ'ন। জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ কাণ্ট্ উপরি-উক্ত সমস্ত কথাই স্বীকার করেন; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন কূটস্থ চৈতন্য, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন

* যাহা কৃত—করিয়া তোলা—গড়িয়া তোলা (যেমন আমিত্ব+রাজত্ব=আমি রাজা) তাহারই নাম কৃত্রিম।

Pure self-consciousness অথবা pure apperception ; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন আভাস চৈতন্য, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন empirical self-conciousness ; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন অন্তঃকরণ, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন internal sense। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, কূটস্থ চৈতন্য আভাস-চৈতন্যরূপে অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হন। কাণ্ট্ বলেন যে, pure self consciousness internal sense এ empirical self-consciousness রূপে প্রতিফলিত হয়। অদ্বৈত-বাদী বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান বিবেকোৎপন্ন (সংক্ষেপে বৈবে-চিক) ; কাণ্ট্ বলেন Pure self consciousness analytic। কাণ্ট্ এবং অদ্বৈত-বাদীর মতে প্রভেদ তবে কি ? প্রভেদ আর কিছু না বৈবেচিক জ্ঞানের প্রতি কাণ্টের মূলেই শ্রদ্ধা নাই—অদ্বৈত-বাদীর তাহার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। কাণ্ট্ বলেন যে, যৌগিক অহম্প্রত্যয় হইতে রাজত্ব চাসাত্ব পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব প্রভৃতি সমস্ত ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট থাকে কেবল-মাত্র 'আমি=আমি', 'আত্মা=আত্মা'। আত্মজ্ঞান চতুর্দ্দিকের জঞ্জাল হইতে পরিমার্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু তাহার ফল হইল -'ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল'। কেন না বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান অপর কোনো কিছুর সহিত যোগযুক্ত হইয়া অহংজ্ঞান রূপে প্রতিফলিত না হইলে—'আমি' বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সুতরাং 'আমি=আমি' আর $x=x$, এ দুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। অদ্বৈতবাদী কাণ্টের এ কথা যে, অস্বীকার করেন তাহা নহে ; অদ্বৈতবাদী খুবই তাহা স্বীকার করেন—স্বীকার করিয়াও তিনি বলেন যে, বাক্য-মনের অতীত $X=X$ প্রাপ্ত হইলে জীব যদি জন্ম-মৃত্যুর দায় হইতে চিরকালের মত অব্যাহতি পাইতে পারে, তবে তাহাই জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে হেগেল যাহা

বলেন তাহা আমি হেগেলীয় চুল-চেরা ভাষায় হেগেলোচিত সূক্ষ্ম-প্রণালীতে বলিতে সাহস করি না; দৃষ্টান্তের স্থূ-পুরু কাচের মধ্য-দিয়া—মোটামুটি রকমে—ইঙ্গিত ইসারায়—তাহার কথঞ্চিৎ আভাস-মাত্র প্রদান করিতেছি। ইহাতে যদি পাঠক সন্তুষ্ট না হইয়া হেগেলের সহিত সবিশেষ পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি হেগেলকে চেনেন না! নিতান্তই যদি তিনি হেগেলের নিজ মূর্ত্তির দর্শনাভিলাষী হ'ন, তবে তিনি দার্শনিক অস্ত্রশস্ত্রে রীতিমত সুসজ্জিত হইয়া হেগেলীয় দর্শন-মহারণ্যের গোলোকধাঁদায় প্রবেশ করুন—কিন্তু যেন সেই নিবিড় মহারণ্যের ভিতরে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতগতি ফিরিয়া আসিয়া না বলেন 'ত্রাহি মধু-সূদন! আমি আর ও দিকে না—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও!' মোটামুটি হেগেলের কথার ধরণ এইরূপঃ—

রাজাকে তুমি রাজত্ব-অভিমান ছাঁটিয়া ফেলিতে বলিতেছ—কিন্তু আমি তাহা বলি না। রাজাকে আমি বলি যে, তোমার রাজত্ব-অহঙ্কার পদার্থটা কি তাহা তুমি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ। তাহা হইলে দেখিবে যে প্রজা না থাকিলে তুমি রাজা হইতে পার না। প্রজা যদি চাস না করে তবে তোমার রাজত্ব কোথায় থাকে? অতএব তোমার প্রজা যেমন তোমার অধীন—তুমিও তেমনি তোমার প্রজার অধীন। তুমি এবং তোমার প্রজাবর্গ পরস্পরাধীন। তুমি তোমার প্রজাবর্গের প্রভু এটা আংশিক সত্য। সমগ্র সত্য এই যে, তুমি তোমার প্রজার প্রভুও বটে, দাসও বটে। শেষোক্ত সত্যটির উপরেই তোমার স্বাধীনতা নির্ভর করে—যথেচ্ছাচারিতার উপরে নহে। তোমার প্রজা যদি তোমার আপনার হয়, আর তোমার সেই আপনার প্রজার যদি তুমি অধীন হও, তবে তুমি আপনারই অধীন হও—স্বাধীন হও। তোমার হাত যেমন তোমার আপনার—তোমার

প্রজাবর্গ তেমনি তোমার আপনার; আর, আপনার হাতের আঙ্গুল যেমন আপনার আঙ্গুল, তেমনি আপনার প্রজাবর্গের অধীনে অবস্থিতি আপনারই অধীনে অবস্থিতি—তাহা স্বাধীনতা; তাহা পরের অধীনে অবস্থিতি নহে—তাহা পরাধীনতা নহে। অতএব তুমি আপনার হাতকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না; যথেচ্ছাচার দ্বারা প্রজাবর্গকে আপনার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না—তাহাদিগকে পর করিয়া ফেলিও না। স্নেহ-বন্ধন দ্বারা প্রজাবর্গকে আপনার করিয়া লও—আপনার করিয়া লইয়া সেই তোমার আপনারই প্রজা-বর্গের অধীন হও, তাহা হইলে তুমি আপনারই অধীন হইবে—স্বাধীন হইবে। স্বাধীনতার অভ্যন্তরে প্রভুত্ব এবং অধীনতা এই দুই বিরোধী পক্ষ প্রেম-সূত্রে গ্রথিত হইয়া একাধারে অবস্থিতি করে—বাঘে গরুতে একত্রে জলপান করে। কেননা 'আপনি আপনার অধীন' বলিলেই আপনি আপনার প্রভু বুঝায়; স্বাধীন বলিলেই স্বপ্রভু বুঝায়; স্বাধীনতার অভ্যন্তরে প্রভুত্ব এবং অধীনতা উভয়ে সদ্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বাস করে। * মনে কর এক-

---

* উল্লিখিত দৃষ্টান্তটির মধ্যে একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মনে কর আমি একটি বনকে উদ্যান-রূপে পরিণত করিতে সংকল্প করিলাম; আর, সেই সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া লোক জন সমভিব্যাহারে বনাভিমুখে চলিলাম। এরূপ অবস্থায়, আমার সঙ্কল্পিত উদ্যান, যাহা ভবিষ্যতে বাস্তবিকরূপে ফলিত হইবে কিন্তু এখন কাল্পনিক মাত্র, তাহাই আমাকে বনাভিমুখে চালনা করিতেছে। তবেই হইল যে, আমি আমার আপনারই সংকল্পিত উদ্যান-দ্বারা চালিত হইতেছি—আপনারই কল্পনা দ্বারা চালিত হইতেছি;—যখন আপনারই কার্য্য দ্বারা চালিত হইতেছি—তখন আমি আপনারই অধীন—স্বাধীন। যদি আমি পুষ্প-সৌরভের আকর্ষণে দিক্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া বনাভিমুখে চলিতাম তবে আমি পরাধীন হই-

জন নবাভিষিক্ত যুবরাজ হেগেলের এই অমাত্যোচিত সৎপরামর্শ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। হেগেল বলিলেন, 'কাঙ্গালের কথা বাসী

তাম। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—আমার উদ্যান-কল্পনা সর্ব্বাংশে মৌলিক নহে; তাহা পূর্ব্বদৃষ্ট উদ্যানের আংশিক অনুকরণ। সুতরাং উদ্যান-কল্পনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও আমার আপনার কার্য্য কিন্তু পরোক্ষ সম্বন্ধে তাহা প্রকৃতির কার্য্য; এই জন্য আমরা বলি যে মনুষ্য যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বাধীন, তেমনি পরোক্ষ-সম্বন্ধে পরাধীন; তা বই, মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহে। আমার উদ্যান-কল্পনা কতক অংশে প্রকৃতির অনুকরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি অন্য কোনো কিছুর অনুকরণ নহে—তাহা একটি পরমাশ্চর্য্য মৌলিক ব্যাপার; ঈশ্বর কোনো অংশেই পরের অধীন নহেন—তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। স্বাধীনতা-শব্দের অর্থ আপনার অধীনতা self determination। কিন্তু freedom শব্দের মুখ্য অর্থ অনধীন মুক্তভাব। অনধীন মুক্তভাব হইতে কোনো কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। আপনার অন্তর্নিহিত ভাবের এবং আপনার নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করা'র নামই স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করা। আর একটি কথা আছে—সেটি ধর্ম্মের অতীব একটি নিগূঢ় তত্ত্ব; সুতরাং এখানে অল্পের মধ্যে তাহার যৎসামান্য আভাস-মাত্র প্রদর্শন করাই সম্ভবে। সে কথাটি এই:—আমি যখন জানিতেছি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহি তখন সেই সঙ্গে এটাও জানিতেছি যে, ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন; জানিতেছি যে, আমার পরিমিত স্বাধীনতা ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। সাধক ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগী হইয়া আপনার প্রবৃত্তি-দমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-পথে চলিলে তাঁহার স্বাধীনতা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বিকসিত হইয়া ঈশ্বরের স্বাধীনতার নিকটবর্ত্তী হয়; আর যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ধর্ম্মসাধন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। একজন তার্কিক এস্থলে বলিতে পারেন যে, সমস্ত জগৎই যখন বাধ্যবাধকতার অধীন, তখন ঈশ্বরও যে সেরূপ নহেন তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যেখানে দুই বস্তু পরস্পরের

হইলেই ফলে' এই বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ আপনার নবাধিকৃত সিংহাসনের সুকোমল পৃষ্ঠাস্তরণে হেলান দিয়া "আমি মহারাজাধিরাজ" এইরূপ অহংকারে স্ফীত হইলেন—স্ফীত হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজা-বিদ্রোহের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। রাজার মনে নানা প্রকার কুটিল এবং জটিল দুশ্চিন্তা পর্য্যায়-ক্রমে আবির্ভূত হইতে লাগিল। এক দিন রাজার সভাপণ্ডিত কথকের বেদীতে আসীন হইয়া রাম-রাবণের যুদ্ধের উপসংহার ভাগ বর্ণন করিতে করিতে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।'

সে রাত্রে রাজার নিদ্রা হইল না। তিনি শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন "প্রজাবর্গ আমাকে যথেষ্ট কর প্রদান করে, প্রজাবর্গকে আমারও কিছু দেওয়া উচিত—রঘুবংশে পড়িয়াছি

'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ'।

সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার জন্য সূর্য্য পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করে। এ-হেন বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রজার হিতসাধন কার্য্যে—

বাহিরে অবস্থিতি করে সেইখানেই উভয়ের মধ্যে বাধ্যবাধকতার নিয়ম খাটে; পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যে বাধ্যবাধকতার নিয়ম খাটে। কিন্তু সমস্ত জগৎ যখন ঈশ্বরের ঐশী শক্তির উদ্ভাবনা - ঈশ্বরের বাহিরে যখন কিছুই নাই—তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ঈশ্বর কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতার অধীন নহেন—ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি তাহাই সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য—বাদ-প্রতিবাদ কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র; তাই আমি টিপ্পনী-চ্ছলে স্বাধীনতা সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

জন-সাধারণের সেবা-কার্য্যে—তৎপর হইলেন। এইরূপে তিনি রাজা হইয়াও বিবেক-দ্বারা আপনার প্রভুত্ব-অহঙ্কার হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া জন-সাধারণের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। ইহাই হেগেলের বিবেক পদ্ধতি! রাজা একদা প্রভূত রাজ-কার্য্য-ভারে অবসন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রজাবর্গের আমি কি এতই ক্রীতদাস যে, আমি তাহাদের সেবায় জীবন অবসান করিব! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হেগেল-মন্ত্রীর সে দিনকার সে কথা তাঁহার স্মরণাভ্যন্তরে আবির্ভূত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, আমার প্রজা আর কাহারো প্রজা নহে, আমারই প্রজা। তবে আমি তাহাদিগকে আপনার না ভাবিয়া পর ভাবি কেন? আমার হাতের আঙ্গুল, যেমন আমার আপনারই আঙ্গুল, তেমনি আমার প্রজাবর্গের সেবা আমার আপনারই সেবা, তাহা পরের সেবা নহে। আপনার প্রজাবর্গের সেবা করিলে আমি আপনারই সেবা করি—আপনি আপনার সেবক হই—আপনি আপনার অধীন হই, স্বাধীন হই। প্রজাও তেমনি মনে করুক্ যে, আমার আপনার রাজার অধীনে অবস্থিতি আপনারই অধীনে অবস্থিতি—পরের অধীনে অবস্থিতি নহে; তাহা স্বাধীনতা—তাহা পরাধীনতা নহে। প্রত্যেক মনুষ্য তেমনি মনে করুক্ যে, আমার প্রতিবাসী আমার আপনারই ভ্রাতা—আপনার ভ্রাতার সেবা করিলে আপনারই সেবা করা হয়, তা'বই পরের সেবা করা হয় না; সুতরাং তাহাতে স্বাধীনতাই প্রকাশ পায়—পরাধীনতা প্রকাশ পায় না। এইরূপ ভাবিয়া রাজা যথেচ্ছাচারি প্রভুত্বের সিংহাসন হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দাসত্বের বিনীত সোপানের মধ্য-দিয়া স্বাধীনতার দিব্য-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। স্বাধীনতা শুধু কেবল প্রভুত্ব নহে—শুধু কেবল অধীনতাও নহে; তাহা প্রভুত্ব এবং অধী-

নতা-দুয়ের সমন্বয় হইতে উৎপন্ন 'যোগিনস্তৃতীয়ঃ পন্থা'; তাহার সাক্ষী—আপনি আপনার অধীন=আপনি আপনার প্রভু। ইহাই হেগেলের সমন্বয়-পদ্ধতি। সমন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুত্বরূপী বর এবং অধীনতা-রূপিণী কন্যা বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইলে সেই শুভ বিবাহের ফল হয় এইরূপ;—অধীনতার সংশ্লেষে প্রভুত্বের অযথা-অহঙ্কার ঘুচিয়া যায়, আর, প্রভুত্বের সংশ্লেষে অধীনতার অযথা দৈন্য ঘুচিয়া যায়; এই প্রকারে প্রভুত্ব এবং অধীনতা উভয়ে সুসংস্কৃত এবং সুসংহত হইয়া স্বাধীনতায় পরিণত হয়। পাঠক নিম্নে অবলোকন করুন:—

(১) আমিত্ব × প্রভুত্ব=আমি সর্ব্বেসর্ব্বা=অযথা অহঙ্কার।

(২) আমিত্ব × অধীনতা=আমি কিছুই নহি=অযথা অহংশূন্যতা।

(৩) আমিত্ব × অধীনতা × প্রভুত্ব=আমি আপনার অধীন=আমি আপনার প্রভু=স্বাধীনতা।

প্রথমটি অবিবেক-প্রধান অহঙ্কার; ইহা হেগেলের স্থাপন-পক্ষের অধিকারে, এবং অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষের অধিকারে, অবস্থিতি করে।

দ্বিতীয় টি বিবেক-প্রধান অহংশূন্যতা; ইহা হেগেলের প্রতিযোগ-পক্ষের অধিকারে, এবং অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত-পক্ষের অধিকারে, অবস্থিতি করে।

তৃতীয়টি যোগ-প্রধান স্বাধীনতা; ইহা হেগেলের সমন্বয়পক্ষের অধিকারে অবস্থিতি করে; তদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদীর কোনো পক্ষেই অধিকার পায় না।

বিবেক-শব্দের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, তাহা বিবেচনা-ক্রিয়ার ফল; আর, আমরা যাহাকে সমন্বয় অর্থে গ্রহণ করিতেছি সেই যোগ-শব্দের গায়ে লেখা আছে যে, তাহা যুক্তি-ক্রিয়ার ফল।

অবিবেক হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে রাজার সেই-যে মনে হইয়াছিল যে, আমি আবার প্রভু কিসের—আমি প্রজাবর্গের অধীন ভৃত্য, সেটা তাঁহার বিবেচনা-কার্য্য, এবং তাহার ফল বিবেক। তাহার পরে রাজার মনে এই যে এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল যে, আমি প্রভুত্ব-অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দিয়াও প্রভুত্বে বঞ্চিত হইতেছি না; যেহেতু প্রজাবর্গ আমার আপনার—আমি আপনারই প্রজার অধীন—আপনারই অধীন, আপনি আপনার অধীন—আপনি আপনার প্রভু, প্রভুত্ব এবং দাসত্ব আমাতে নির্ব্বিরোধে অবস্থিতি করিতেছে—এটা হ'চ্চে তাঁর যুক্তি-কার্য্য; আর, যুক্তি-কার্য্যের (অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ যোজনা-কার্য্যের) ফলযোগ বা সমন্বয়। অতএব এটা স্থির যে, হেগেলের অভিপ্রায়ানুযায়ী যোগাত্মক স্বাধীন আত্মা, অদ্বৈতবাদীর বিবেকাত্মক X=X নহে। প্রতিবাদীর ন্যায় যাঁহারা যোগাত্মক স্বাধীন আত্মা এবং বিবেকাত্মক × = ×, এদুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়াও দেখেন না, যাঁহারা বিলীন হওয়াকেই আত্ম-লাভ মনে করেন, তাঁহাদের অযৌক্তিকতা-সম্বন্ধে Professor Andrew seth এই রূপ বলিয়াছেন "Comment would but weaken the audacious irony of phrases which make accomplishment tantamount to disappearence, and interpret 'gift' of personality as meaning the 'dissipation' of personality."

পঞ্চদশীতে ভাগত্যাগ-লক্ষণা-দ্বারা আত্মজ্ঞানে উপনীত হইবার যেরূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখিবা মাত্র পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা নিতান্তই একরোখা বিবেক-পদ্ধতি—তাহার মধ্যে সমন্বয়-পদ্ধতির নাম-গন্ধও নাই। যিনি কস্মিন্ কালেও কোনো অদ্বৈত-বাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থের মর্ম্মের ভিতরে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ

করিয়াছেন—নিশ্চয়ই তিনি আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, ভাগত্যাগ দ্বারা মায়া এবং অবিদ্যা একবার পরিত্যক্ত হইলে সেই পরিত্যক্ত অবিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত করিয়া লইবার বিধান নিতান্তই নূতন শাস্ত্র। অথচ প্রতিবাদী আমার নাম উল্লেখ করিয়া অম্লানবদনে বলিতেছেন যে, 'তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদীরাই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যে, ভাগত্যাগ দ্বারা ঐক্য প্রদর্শন করিতেছেন সেই পরিত্যক্ত ভাগ সমূহও অন্তর্নিহিত ঐক্যগ্রন্থিরই স্বভাব-সিদ্ধ পরিণাম?" ইহার উত্তরে আমি বলি যে, প্রতিবাদী কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদী সাংখ্যের ন্যায় পরিণামবাদী নহেন? তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদীর মতে অবিদ্যা জীবাত্মার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে? তিনি কি জানেন না যে, সেই ভ্রম বিনষ্ট হইলে অবিদ্যাবাদীর মতে আত্মা মুক্তি-লাভ করে? তিনি কি জানেন না যে, পরিত্যক্ত অবিদ্যা মুক্ত আত্মার ত্রিসীমার মধ্যেও ঘেঁসিতে পারে না? তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে বলিতেছেন যে, অদ্বৈতবাদীর মতে "পরিত্যক্ত ভাগসমূহ অন্তর্নিহিত ঐক্যগ্রন্থিরই স্বভাব-সিদ্ধ পরিণাম।" প্রতিবাদীর সহিত অনর্থক দ্বন্দ কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে আমার মত কিরূপ, আর, স্বদেশীয় শাস্ত্রের সহিত তাহার ঐক্যানৈক্যই বা কিরূপ, তাহা যত সংক্ষেপে পারি, প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। *

---

* পঞ্চদশীকার অদ্বৈতবাদের সমস্ত মূল কথাই তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অতীব পরিষ্কাররূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন—সে কথাগুলি এইঃ—(১) জীবাত্মার সচ্চিদানন্দতা। (২) জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। (৩) অবিদ্যার প্রভাব। (৪) সৃষ্টি-প্রকরণ। (৫) পঞ্চকোষ-বিবেক। (৬) ভাগত্যাগ লক্ষণা। (৭) শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। (৮) ধর্ম্মমেঘ সমাধি। (৯) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। (১০) অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

ঈশ্বর দ্বৈতাদ্বৈত মতের কেন্দ্রস্বরূপ। প্রকৃতি অরাবলী স্বরূপ। সূর্য্যের যেমন করাবলী, কেন্দ্রের তেমনি অরাবলী, আত্মার তেমনি আত্মপ্রভাব, পরমাত্মার তেমনি ঐশীশক্তি। প্রাজ্ঞ জীব-মণ্ডলী পরিধি-স্বরূপ, এবং এক একটি প্রাজ্ঞজীব এক একটি অরের বহিঃ-প্রান্ত স্বরূপ +। অরাবলী-কেন্দ্র এবং পরিধির পরস্পর ব্যবধান

পঞ্চদশীকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা চুম্বকাকারে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন। তেমনি আবার, প্রথম অধ্যায়ে তিনি পঞ্চ-কোষ-সম্বন্ধে যাহা চুম্বকাকারে বলিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হইতে পারে যে, পঞ্চদশীকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যাহা চুম্বকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—পর-পর-বর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিস্তারিতরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী অম্লান বদনে বলিতেছেন যে, "পঞ্চদশীর 'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্র বাবু সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক ছবি পাইলেন এ অতি আশ্চর্য্যের কথা। যদি তাহাই সম্ভব হইত, তবে পঞ্চদশীকার শেষ চতুর্দশ অধ্যায় না লিখিলেও পারিতেন।" কোনো গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আপনার সমগ্র মন্তব্য কথাটি চুম্বকাকারে উপন্যস্ত করিয়া শেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবিস্তরে পরিস্ফুট করিলে তাঁহার সেরূপ কার্য্য বড়-যে-একটা অসম্ভব ব্যাপার তাহা বোধ করি কেহই বলিবেন না। তবে যে, প্রতিবাদী সম্ভবকে অসম্ভব মনে করিতেছেন, তাহা এক-প্রকার রজ্জুতে সর্পভ্রম—তাহার মূল কারণ প্রতিবাদ-প্রিয়তা-রূপিণী অবিদ্যা!

+ চক্রের পরিবর্ত্তে কুণ্ডলীর অথবা আবর্ত্তের উপমা দিলে আরো ঠিক হইত। কেননা কুণ্ডলীর বেষ্টনপথের যে কোনো স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া—একদিক্ দিয়া চলিলে আবর্ত্তমুখে-পতিত নৌকার ন্যায় উত্তরোত্তর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়—আর এক-

এবং বন্ধন দুয়েরই সম্পাদক;—প্রকৃতি একদিকে তমোগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব ঢাকিয়া রাখিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে ব্যবধান স্থাপন করে, আর একদিকে সত্ত্বগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে বন্ধন ঘনীভূত করে। সাংখ্যদর্শন কেন্দ্রকে গণনা হইতে বর্জ্জিত করিয়া অরাবলী এবং পরিধির উপরেই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; বেদান্ত-দর্শন অরাবলীকে মায়াবোধে তুচ্ছ করিয়া কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছেন—ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন একদিকে বলেন যে, জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় সমস্তই অচেতন প্রকৃতির কার্য্য—পুরুষ (জীবাত্মা) উদাসীন সাক্ষী মাত্র। আর এক দিকে বলেন যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ লোহ এবং চুম্বকের মত পরস্পরের সান্নিধ্যবশতঃ পরস্পরের সমধর্ম্মিতার ভাণ করে। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ দুইভাবের দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। আমি যখন লিখিতেছি তখন আমার চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ আমার হস্ত কি ভাণ করে যে, সে নিজে লিখিতেছে? অন্ধ প্রকৃতি আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে—"আমি" কাহাকে বলে তাহাও সে জানে না—তবে কেমন করিয়া ভাণ করিবে যে, আমি

দিক দিয়া চলিলে কেন্দ্র হইতে উত্তরোত্তর দূরে পড়িতে হয়। চক্রের বেষ্টন-রেখাস্থিত বিন্দু সকল কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী, কিন্তু কুণ্ডলীর বেষ্টন-রেখাস্থিত বিন্দু সকলের মধ্যে কেহ বা কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে, কেহ বা অল্প দূরে অবস্থিতি করে। এই জন্য জীবগণের উত্তমাধম শ্রেণী-বিভাগ বুঝাইবার পক্ষে কুণ্ডলীর উপমা সবিশেষ উপযোগী। যাহাই হউক্—আমার বর্ত্তমান মন্তব্য কথা বুঝাইবার পক্ষে চক্রের উপমাই যথেষ্ট।

দ্রষ্টা ? আর, তুমি যখন বলিতেছ যে, আত্মা উদাসীন সাক্ষী-মাত্র তা ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন তুমি আর এ কথা বলিতে পার না যে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিচলিত হইয়া আত্মা আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন। যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নির উত্তাপ বিচলিত করিবে কিরূপে ? যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে সুস্বাদু অন্নের আঘ্রাণ বিচলিত করিবে কিরূপে ? চুম্বকের সান্নিধ্য-বশতঃ লৌহ যখন বিচলিত হয়, আর কাষ্ঠ যখন বিচলিত হয় না, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, চুম্বকের প্রতি কাষ্ঠ উদাসীন—লৌহ আসক্ত। চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ বিচলিত হয় হউক্, কিন্তু কাষ্ঠ কেন বিচলিত হইবে ? অতএব সাংখ্য যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়—আত্মা যদি একান্ত পক্ষেই নির্গুণ নিস্পৃহ নিরভিমানী উদাসীন সাক্ষী-মাত্র হ'ন তবে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানে লিপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কোনো প্রকারেই সম্ভব-পর নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা উভয়েরই মূলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্বীকার না করিলে উভয়ে যে কি সূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী, জীবাত্মা এবং প্রকৃতিকে, পরমাত্মার সহিত ভেদাভেদ-সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রকৃতিকে একেবারেই নস্যাৎ করিয়াছেন; এবং সেই-গতিকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে একীভূত করিয়া উভয়কে নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী এক দিকে বলেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ; আর এক দিকে বলেন যে তিনি মায়ারূপ উপাধিতে অধিরূঢ় হইয়া ঐশী শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যদি একান্তপক্ষেই শক্তিহীন হ'ন তবে তিনি কিরূপে মায়াতে অধিরূঢ় হইয়া সগুণ ব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত হইবেন; আর, যদি বল যে, গোড়া হইতেই

নির্গুণ ব্রহ্ম 'স্বগুণৈর্নিগূঢ়ং' আপনার গুণরাশির অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছেন, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে গোড়া হইতেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃত কথা এই যে, সগুণ ব্রহ্মই সমগ্র সত্য—নির্গুণ ব্রহ্ম বীজ সত্য। এ-পিট ও-পিট দুই পিট লইয়া একটা কাগজ হয়; তাহার মধ্যে আমি যখন এ পিটে লিখিতেছি—তখন এ পিটই দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা বলিতে পারি না যে, এই কাগজের এ পিট আছে কিন্তু ওপিট নাই; কেন না যদি ওপিট না থাকিত তবে এপিটও থাকিত না। ব্রহ্ম সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তি-সমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম। যদি জগৎ নাও থাকে তথাপি সেই মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও ব্রহ্মকে শক্তিহীন মনে করিতে পারি না—কেননা তখন স্বয়ম্ভু পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি করিতেছেন—এবং তাঁহার সেই আত্মশক্তিতে সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত।

সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরকে হারাইয়াছেন; বেদান্তদর্শন সাংখ্য হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন। সাংখ্য এবং বেদান্ত এই দুই দর্শনের দুই বিরোধী মতের সমন্বয় দ্বারা যেরূপ সগুণ দ্বৈতাদ্বৈতবাদে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে তাহাই আমি এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সাংখ্য দর্শন মূল প্রকৃতির নাম দিয়াছেন 'অব্যক্ত'; দৃশ্যমান প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্ত; সমগ্র প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্তাব্যক্ত। প্রকৃতির কার্য্য তিনরূপ—ব্যক্ত হওয়া, অব্যক্ত হওয়া, এবং ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করা। প্রকৃতির এই তিনটি কার্য্য দ্বারা তাহার তিনটি গুণ সূচিত হয়;—যেহেতু সাংখ্যের মতে কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন। ব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির ভিতরে সত্ত্ব-গুণ (প্রকাশ-গুণ, সত্তার অভিব্যক্তি-গুণ, বুদ্ধিবৃত্তি) বিদ্যমান আছে;

অব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে তমোগুণ (প্রকাশের প্রতিবন্ধক-জড়তা—মোহ) বিদ্যমান আছে; অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে রজোগুণ (প্রকাশের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, প্রাণ) আছে। ইহার মধ্যে আমার নিজের কথা একটিও নাই—আদ্যোপান্ত সমস্তই সাংখ্যের কথা। সাংখ্যশাস্ত্র হইতে রজস্তমোগুণ এবং বেদান্তশাস্ত্র হইতে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরতত্ত্ব আদায় করিয়া দুয়ের সমন্বয় পূর্ব্বক আমি আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনায় বলিয়াছি যে, ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। ঐশী-শক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে-সে প্রতিবন্ধক তাঁহার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম। 'নিয়ম' শব্দটি আমার নিজের মন হইতে উদ্ভাবন করি নাই; পাতঞ্জল-দর্শনের সাধন-পাদের ১৮ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকায় এইরূপ স্পষ্ট লিখিত আছে—

প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ (অর্থাৎ প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম);

ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ (প্রবৃত্তিরূপা ক্রিয়া রজোগুণের ধর্ম্ম);

স্থিতির্নিয়মরূপা তমসঃ (নিয়মরূপা স্থিতি তমোগুণের ধর্ম্ম) এখন আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই;—

ভূমি হইতে যখন উৎস উৎসারিত হয় তখন তাহাতে ভৌতিক নিয়মের অধীনতাই প্রকাশ পায়। রাজার অহঙ্কার হইতে যখন অত্যাচার উৎসারিত হয়, তখন তাহাতে অবিদ্যারই অধীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি ভৌতিক নিয়মেরও

অধীন নহে, অবিদ্যারও অধীন নহে। জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি তাঁহার আপনারই নিয়মের অধীন। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় স্বীয় শক্তি বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপনার ভাব এবং আপনার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে, ঈশ্বর এক মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে তিনি কাহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিবেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে? শরীরের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্বিতীয়—সর্ব্ব জগতে তেমনি পরমাত্মা অদ্বিতীয়—সুতরাং দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহাকাশের ন্যায় অসঙ্গত। তবে কি ঈশ্বর আপনার সমগ্রভাব কোনো জীবাত্মার নিকটে প্রকাশ করিবেন? তাহা হইতে পারে না—যেহেতু ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে পারা অসম্ভব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, দুর্ব্বিপত্তি এবং অশান্তি হইতে শান্তির দিকে যথাক্রমে এবং যথানিয়মে লইয়া যাইতেছেন। অতএব জগতে অজ্ঞান থাকিবেই, পাপ থাকিবেই, অশান্তি থাকিবেই। কিন্তু আবার, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এমনি সর্ব্বজয়ী যে, অজ্ঞানকে দমন করিয়া জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—পাপকে দমন করিয়া পুণ্য উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—নানা প্রকার অশান্তি এবং উপদ্রব দমন করিয়া শান্তি উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই। কেননা ঈশ্বর আপনার ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ করিবার জন্যই আপনার অব্যক্ত শক্তিকে ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন। পৃথিবীতে ঐশ্বরিক ভাবের চরম অভিব্যক্তি কি? না জীবাত্মার বুদ্ধিস্থ জ্ঞানালোক; কেননা জগৎ হইতে জ্ঞানালোক অপসারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়। জ্ঞানালোকের প্রতিবন্ধক কি?

না তমোগুণ। তমোগুণ কি? না ঈশ্বরের আপনার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম—ঈশ্বরের হস্তের রাশ; কেননা ঈশ্বরের প্রকাশ স্ফূর্ত্তি ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তা বই, তাহা বাহিরের কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। এখন বেস বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বরের ঐশীশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা শব্দের বাচ্য হয় কেন? ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাত্মিকা, নিয়মাত্মিকা—তাই ত্রিগুণাত্মিকা।

পঞ্চদশী বলেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং মায়া-দ্বারা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর একদিকে আবার তিনি এবং আমাদের দেশের দ্বৈতাদ্বৈত সকল শাস্ত্র একবাক্যে বলেন যে, কর্ম্ম অনাদি। তবেই হইতেছে যে, কর্ম্মীও অনাদি—জীবও অনাদি; যেহেতু কর্ম্মীর আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ম্ম থাকিতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে ঈশ্বর জগতের অভ্যন্তরে জীব-রূপে প্রবেশ করা'তে তবে তো জীব আবির্ভূত হইল, তাহার পূর্ব্বে তো নয়! তবে আর জীব অনাদি কেমন করিয়া? কিন্তু বাসনা অনাদি, কর্ম্ম অনাদি, জীব অনাদি, এ কথা বলে না এমন শাস্ত্রই আমাদের দেশে নাই। সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, কর্ম্ম অনাদি সুতরাং জীবাত্মা অনাদি। এইখানে অদ্বৈতবাদীর দুইভাবের দুই কথা ধরা পড়িল:—

(১) ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে জীবরূপে প্রবেশ করিলেন।

(২) ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে জীবগণকে কর্ম্মফল বিতরণ করিতেছেন।

কাণ্টের দর্শনশাস্ত্রে (ঠিক্ এরূপ নহে কিন্তু) ইহারই অনুরূপ একটি দ্বিমুখী তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাণ্ট বলেন যে, মনুষ্যের

স্বাধীন পুরুষকার কার্য্য-কারণ প্রবাহের অতীত। কার্য্য-কারণ প্রবাহ এবং কালপ্রবাহ এ পিট ওপিট। সুতরাং মনুষ্যের স্বাধীন পুরুষকার একটি কালাতিগ তত্ত্ব। কিন্তু সেই স্বাধীন পুরুষকার দ্বারা যে কোনো কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় তাহা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অন্তঃপাতী সুতরাং তাহা একটি কালাশ্রিত ঘটনা। তাহা যখন কালাশ্রিত ঘটনা তখন তাহার কারণও কালাশ্রিত। তবেই হই-তেছে যে, মনুষ্য-কৃত কার্য্যের কারণ দুইরূপ—কালাতিগ পুরুষকার এবং কালাশ্রিত বৈষয়িক প্রবর্ত্তনা। আমি যদি এক জনকে দশ টাকা দান করি—তবে সেই দান কার্য্যের কালাশ্রিত কারণ-পরম্পরা অনন্ত;—প্রথম কারণ আমার হস্ত; তাহার পশ্চাতে দ্বিতীয় কারণ সেই হস্তের পরিচালক ধমনী; তাহার পশ্চাতে তৃতীয় কারণ সেই ধমনীর নিয়ামক মস্তিষ্ক; তাহার পশ্চাতে চতুর্থ কারণ সেই মস্তিষ্কের পরিপোষক অন্ন; তাহার পশ্চাতে পঞ্চম কারণ সেই অন্নের উৎপাদক পৃথিবী, তাহার পশ্চাতে ষষ্ঠ কারণ সেই পৃথিবীর উৎপাদক সূর্য্য—ইত্যাদি। এই গেল দান কার্য্যের কালাশ্রিত কারণ পরম্পরা। তাহার কালাতিগ কারণ একটি বই নয়—কি? না কর্ত্তার পুরুষকার।

প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ প্রশ্নের বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই; কেননা দশ কোটি বৎসরই বল, আর, সহস্র কোটি বৎসরই বল—ব্রহ্মার তাহা এক দিনও নহে—এক পলও নহে—এক মুহূর্ত্তও নহে। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত এবং দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বের মুহূর্ত্ত দুয়ের মধ্যে আমরা যতটা প্রভেদ মনে করি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতারই পরিচয় প্রদান করে, তা বই তাহা বাস্তবিক সত্যের পরিচয় প্রদান করে না। ইউক্লিডের জ্যামিতিক

ভাষায় ভেদাঙ্কুর-গণিত differential calculus ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যেমন সুদুষ্কর, তেমনি কালিক ভাষায় কালাতিগ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো সুদুষ্কর। কিন্তু তাহা বলিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মনুষ্যের জ্ঞানের অগোচর নহে—মনুষ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একান্ত পক্ষেই বুঝিতে না পারে এমন নহে। তবে কি না, তাহা তলাইয়া বুঝিতে হইলে সাধনের নিতান্তই প্রয়োজন। সাধনের প্রণালী নূতন কোনো কিছু নহে, তাহা নানা শাস্ত্রে নানা রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে;—সমস্তের সমন্বয় দ্বারা আমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই:—সাধন সোপানের তিনটি পংক্তি বা ধাপ; (১) বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা অহংকার এবং বিষয়াসক্তি মন হইতে নির্ধৌত করিয়া ফেলা সাধন সোপানের প্রথম পংক্তি। ইহা একরূপ আধ্যাত্মিক স্নান। ভৌতিক স্নান দ্বারা যেমন গাত্র-শুদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক স্নান-দ্বারা তেমনি চিত্ত-শুদ্ধি হয়। এইরূপ স্নানের অব্যবহিত ফল হয়—অন্তঃকরণে অহংকারের পরিবর্ত্তে দৈন্য, বিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য। তাহার পরে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণতা আত্মার অভ্যন্তরে প্রতীয়মান হয়। কেননা পরমাত্মার পূর্ণতা আদর্শরূপে সাধকের অন্তঃকরণে নিহিত আছে বলিয়া তাহারই প্রতিযোগে সাধক আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে। আতপের প্রতিযোগেই ছায়া-দৃষ্টি-গোচর হয়; আর, বৃক্ষের তলস্থিত ছায়াই বলিয়া দেয় যে, বৃক্ষের মস্তকের উপরে সূর্য্যাতপ অবিষ্ঠান করিতেছে *। সাধকের বাসনাবর্জ্জিত অহংকার-

---

* All imperfect things must continually demonstrate the Perfect for the reason that they do not exist by reason of their defects but through what of truth

বর্জ্জিত দীন হীন এবং শূন্য হৃদয় আপনার অন্তরে পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার সংস্পর্শ উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। তাহার পরে সাধক সাধুসঙ্গ এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

(২) ধ্যানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে করিতে ক্রমশই সাধকের ঈশ্বর-প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হয়;—প্রীতির পরিপক্ক অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া এইরূপ কথা বাহির হয় যে,

"স এষ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং আর আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়। পরমাত্মাতে সাধকের প্রীতি সম্বন্ধ ঘনীভূত হইলে, আর তাঁহার ঈশ্বরকে পর বলিয়া মনে হয় না—আপনা হইতেও আপনার বলিয়া মনে হয়।

(৩) সাধকের ঈশ্বর-প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হইলে ঈশ্বরেতে তাঁহার আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা বলবতী হয়। তদনুসারে তিনি ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যথা-কর্ত্তব্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরকে তিনি আপনা হইতেও আপনার মনে করেন; এই জন্য ঈশ্বরের অধীনতাকে তিনি আপনারই অধীনতা মনে করেন—স্বাধীনতা মনে করেন। ঈশ্বর যদি তাঁহার 'পর' হইতেন তবেই তিনি ঈশ্বরের অধীনতাকে পরাধীনতা মনে করিতেন।

ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার

---

there is in them ; and the imperfection is continually manifesting the want of the Perfect.

(একটি ইংরাজি দার্শনিক পত্রিকা-হইতে উদ্ধৃত)

অধীনে নিযুক্ত করার নামই অধ্যাত্মযোগ; এইরূপ অধ্যাত্মযোগেই আত্মার স্বাধীনতা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয়। এইরূপে (১) আধ্যাত্মিক স্নানানন্তর ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া, (২) ঈশ্বরের প্রেমামৃত রস-পান করিয়া, (৩) অধ্যাত্ম-যোগে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত উত্তরোত্তর উন্নতি-সোপানে আরোহণ করাই মনুষ্যের পরম-পুরুষার্থ। দার্শনিক মতামত বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, সাধক বিবেক দ্বারা দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে উপনীত হ'ন এবং অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদে উপনীত হ'ন। সাধক যখন সাধনের প্রথম সোপান হইতে (বিবেক-সোপান হইতে) দ্বিতীয় সোপানে (যোগ-সোপানে) পদনিক্ষেপ করেন তখনই দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ উভয়ে পরস্পরের সংশ্লেষে সুসংস্কৃত এবং সুসংহত হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পরিণত হয়।